KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 23/3 24/1 24/2 (Special NO.) 24/2 (Special NO.) 24/4 25/3	Year of Publication : March 1959 Sep 1959 Jan 1960 (আষাঢ় ১৩৬৭) (চৈত্র ১৩৬৭)
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু

আশ্বিন ১৩৬৬
এক টাকা

কবিতা

বর্ষ ২১

বর্ষ ২২

ও

বর্ষ ২৩-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সংখ্যা ১।০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ২৯

কবিতা

শততম সংখ্যা

পৌষ, ১৩৬৬

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হবে

- আধুনিক বাংলা কবিতার অনুবাদ
- বিশিষ্ট বিদেশী কবিদের মৌলিক কবিতা
- আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে আলোচনা

সংখ্যাটির দাম হবে দুই টাকা,
কিন্তু বার্ষিক গ্রাহকদের অতিরিক্ত
দিতে হবে না

প্রকাশের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ১৯৬০

রেল পুতুল

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের এই পোড়ামাটির পুতুল কবে কোন গ্রামীন শিল্পী
রূপায়িত করেছিল কে জানে! হয়ত, সে দেশের মাটিতে লৌহবর্ত্ম
যখন প্রথম সম্প্রসারিত হয়েছিল; হয়ত বা তারও আগে—লৌহবর্ত্মের
আগমন কামনায় কোন লোক-শিল্পীর মানস-সৃষ্টি এই রেল পুতুল!
শতাব্দী-প্রাচীন মানুষের কল্পনায় ও কামনায় স্বাগত এই রেলপথ।
তার নির্বিঘ্ন ও নির্ভরশীল পরিবহণে মানুষের সর্বাঙ্গীন
কল্যাণ সম্ভব হ'য়ে উঠুক—তার উৎসব- আনন্দ নিবিড় হোক।

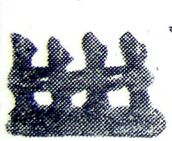

পূর্ব রেলওয়ে

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬৬
বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১
ক্রমিক সংখ্যা ৯৯

তিনটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

নির্জন হাঁসের ছবি

নির্জন হাঁসের ছবি দেখি স্বপ্নে—চারিদিকে অন্ধকার ঘর,
রুপোলি গরিমা তার—যেন হীরকের হিংসা ঘুমের ভিতর।
যত দূর চোখ যায় কারুর মুখের মেধা নদী যেন স্থির,
কারুর মেধার মতো যেন অরণ্যেরা
রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা
শান্ত সব প্রতিবিম্ব ;—এই সব বেদনার স্তর।

বড়ো-বড়ো গাছ

বড়ো-বড়ো গাছ কেটে ফেলছে তারা।
এই সব উঁচু-উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিলো ;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ ;
আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শূন্যতা ;
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্র যে-আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজো মানুষের প্রয়াস।

অনেক দিন দেখেছি : উঁচু-উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ;

আরো অনেক দিন দেখেছি : উঁচু-উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে নীল জাফরান হ'য়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ;
তবুও তারপর দেখেছি : রাত্রির সমুদ্রের পারে নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন
এক-একটা গাছ—

হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে ব'লে—

মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে।

মনকে আমি নিজে

এই জীবনের ছকে-কাটা খেলার ঘরে এসে
হিসেব ক'রে তোমাকে ভালোবেসে
আমি যদি জয়ী হতাম—আলো পেতাম না তো।
ভালোবাসার অকূল সাগর বটের পাতায় ভেসে
পাড়ি দিতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালোবেসে।

*

তোমায় ভালোবেসেছি ব'লে ঋণ
অথবা চুরি ক'রে আমি এই জীবনের দিন
পেয়েছি,—চোর ভালোবাসার ধর্মে জ্ঞানী ব'লে
মরণনদী মুছে জীবননদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছো একা তুমি।

*

যদি এমন চ'লে যাবে তবে
কালের মহাসাগর হ'য়ে রবে
আমার হাতের জলের অঞ্জলি ;—
মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি।

ভিখারিনী

জ্যোতির্ময় দত্ত

বুড়ি নয়। আসলে গাছের প্রেত
কোনো এক পুরাকালে ঝড়ে প'ড়ে গিয়ে
এখন ভিখিরি সেজে ব'সে আছে চটের বাকলে।
এতো স্থির মনে হয় ফুটপাতে ইটের তলায়
কে জানে হয়তো আজো আছে তার শিকড় ছড়ানো।

কখনো-কখনো, খুব নিস্তব্ধ দুপুরে,
যেখানে সে ছিলো, দেখি, বুড়ি নেই। শুধু
শীতল, গভীর, গাঢ় অন্য কিছু ফুটপাতে প'ড়ে।
বহুকাল ব'সে থেকে রেখে গেছে শরীরের ছাপ ?
যদিও হারিয়ে গেছে এখনো রয়েছে প'ড়ে ছায়া ?

আছে সে কি সশরীরে ? নাকি কোনো দূর শতকের
মরীচিকা আজ ঐ ফুটপাতে কাঁপে ?
এমন রোদ্দুরে বুঝি প্রেতেরাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ?
অথবা হয়তো এরা বায়ুতে গোপন লিপি
অদৃশ্য কালিতে লেখা সাংকেতিক ভাষা ;—

শহরের গায়ে কেউ এই সব চিহ্ন এঁকেছিলো,
ভেবেছে উঠবে ফুটে এ-নগরে আগুন ধরলে,
স্পষ্ট হবে প্রলয়ের বাণী,
দুপুরে গরমে আজ সেই চিঠি ফাঁস হ'য়ে গেছে ;
এই ছাখো, লেখা আছে ভিখারিনী, অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ বাস্তুহারা,

কয়েক আঁচড় মাত্র,—রূপ নিলো হ্যাংলা কুকুরি,—
এবং ফুটকিগুলো—কুকুরের ছানা,—
চর্মসার সেই চিহ্ন—তার গায়ে লেগে আছে যেন।
এ-প্রেত-স্তনের মূলে উষ্ণ, ঘন দুধ আছে জমা।

হে সূর্য! মার্তণ্ডদেব! ঘন মেঘে ঢাকো
তোমার প্রদীপ্ত মুখ; এ-নয়ন অন্ধ হ'য়ে যাবে।

বৃষ্টিতে ভিজছে এক কাক আর বুড়ি।
বৃষ্টির অ্যাসিডে যদি ক্ষ'য়ে গিয়ে-গিয়ে
পৃথিবীটা হ'য়ে যায় ক্ষীণ এক নুড়ি
তবু তারা নড়বে না, বলবে না কেউ কোনো কথা।

চারটি কবিতা

শিল্পী

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

তোমার প্রশস্তি রটে জনস্রোতে হাটে ও বাজারে।

বিমুগ্ধ ভক্তের দল করজোড়ে ঢেলে দেয় স্তুতি
নিপুণ সংলাপ টানো বালিকা-সুলভ কণ্ঠস্বরে,
এখনো হয়নি কিন্তু এদিকের ঈপ্সিত প্রস্তুতি।

প্রাকৃত প্রণয়ে মগ্ন সংখ্যাতীত তোমার প্রেমিক,
মনোরম গল্প রটে, কানাকানি নিত্য যায় শোনা;
সুদক্ষ শিল্পীর পক্ষে মিলে গেছে সব ঠিক-ঠিক—
অপাত্রে ঢেলো না, সখী, অহেতুক তোমার করুণা।

সুখপাঠ্য উপন্যাসে আমি এক নিরেট অধ্যায়।
তোমার পায়ের শব্দে আতঙ্কিত নির্জন দুপুর,
পরিত্রাণ অসম্ভব: ভীতিকর অসুখী সন্ধ্যায়
অন্তরালে বেজে ওঠো শরীরিণী খেয়ালি নূপুর।

সময়কে জেলে রাখো অন্ধ অবচেতনার তীরে,
পতঙ্গের মতো রাত্রি পুড়ে মরে তোমার শরীরে।

কোনো জীবিত কবির প্রতি

তোমার মৃত্যুর পরে পনেরোটি প্রবন্ধ বেরোবে
বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে। শোকসভা বসবে জমাট
বক্তৃতার ফাঁকে-ফাঁকে বীরবৃন্দ কপালের ঘাম মুছে নেবে,
বিদূষক সভাপতি নিজেকেই ভাববে সম্রাট।

তোমার কীর্তিকে ঘিরে অন্য কীর্তি করবে ঘোষণা
গ্রন্থকীট গবেষক, সামাজিক সুযোগসন্ধানী;
উদ্ধৃতির কাঁটাতারে বাঁধা হবে কবিতার ফসলের সোনা,
ঘুরবে প্রসন্ন চিত্তে পরিতৃপ্ত বুদ্ধিমান প্রাণী।

জানি, তুমি মৃদু হেসে চ'লে যাবে এই অবসরে
শোকের সমুদ্র থেকে আলোকিত উৎসের সম্মুখে
পার হ'য়ে মহানদী প্রার্থনা জানাবে কণ্ঠস্বরে
আরক্ত পায়ের চিহ্ন বিচলিত সময়ের বুকে।

অংশত মানুষ আর প্রকৃতির রংগ্রের সীমা
খুঁজে-খুঁজে চ'লে যাবে অন্য এক পৃথিবীর পথে,
যৌবনের রক্তপদ্মে উন্মোচিত মৃত্যুর মহিমা
আলো হাওয়া মেঘ পাখি খুঁজে পাবে নিজস্ব জগতে।

মাটির পৃথিবী আর তৃপ্তিহীন মানুষের ঘরে
অম্লান ঐশ্বর্যে তুমি জ্ব'লে ওঠো অতি সংগোপনে,
তোমার অস্তিত্ব শুধু আঁকা হবে আলোর অক্ষরে
প্রেমিকের রক্তস্রোতে, কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, চুম্বনে।

অন্ধকারের গল্প

বুলু এসে ডুবে গেলো বলরাম সরকারের ঘাটে।

উজ্জ্বল দুপুরে রৌদ্র : শহরের মানুষের ভিড়ে
শব্দের শরীর ক্রমে হিম হ'লো অনন্তর হাটে,
অস্তিমে শীতল শান্তি শোকাহত স্রোতের গভীরে।

কতদিন লুকিয়েছে ক্যারমের ঘুঁটি কিংবা তাস
বন্ধুর আড্ডায়; আজো রবিবারে অলস দুপুর
কাটানোর কথা ছিলো অন্তরঙ্গ গল্পের আকাশ
বুকে নিয়ে। কিন্তু তার রক্তস্রোতে তরঙ্গিত সুর
অন্ধকারে আতঙ্কিত আকাঙ্ক্ষার আঘাতে চঞ্চল,
এতক্ষণে নিয়ে গেছে বহুদূরে জোয়ারের জল।

ভালোবেসে হেঁটেছিলো পনেরোটি বছরের পথ নিরুদ্দেশে
বৃষ্টিঝরা রাত্রি আর আশ্বিনের আনন্দে, শঙ্কায় :
জীবনের সমুদ্রকে পার হ'তে গিয়ে অবশেষে
মাঝ-পথে ডুবে গেলো সামান্য গঙ্গায়।
অশান্ত অস্তিত্ব তার অগোচরে পেয়েছে সম্মান,
পরিণামে সব গল্প আলোর আতিথ্যে কম্পমান।

সারাদিন চটকলে জেটিতে ক্রেনের ওঠা-নামা
অশান্ত ঘর্ঘর শব্দে; কাঠ ঘড় ইট চুন বালি
পাটের ঐশ্বর্য নিয়ে মহাজনী নৌকোর হাঙ্গামা
চুকিয়ে মাঝিরা শোনে অশথে হাওয়ার করতালি।

ঢেউগুলো নেচে নেচে সারাদিন গল্প ব'লে যাবে
জীবন মৃত্যুতে মগ্ন কাহিনীরা পরমায়ু পাবে নিরবধি,
শতাব্দীর পুরাতন গাঢ়তম রক্তধারা স্মৃতিকে ভেজাবে,
অবিরল ব'য়ে যাবে রূপালি কান্নায় ভরা আকাশের মতো এক নদী।

এ-ঘাটে দাঁড়িয়ে শুধু মনে হবে সব আলো খুব ধীরে-ধীরে
ঘুমিয়ে পড়েছে ম্লান আলোকিত ঘুমের গভীরে।

সমাপ্তি

কাহিনীরা সমার্থক সংযোজিত পুনশ্চ সংলাপে।
অন্ধকার রাত্রি তার চূর্ণ করে ধূসর দর্পণ,
বার্ধক্যে বিপন্ন রক্ত আলোকিত সর্বশেষ ধাপে
সুতরাং শুভংকর তোমার আতিথ্য কিছুক্ষণ।

দৈহিক দূরত্ব আর ঐকান্তিক শতেক শপথে
ক্রমশ নিকটতর, নগ্নতার ক্লান্তি, অবসাদ ;
প্রাণদ শক্তির উৎস লবণাক্ত শোণিতের স্রোতে :
সংগোপনে জন্ম দেয় মৃত্যুমগ্ন জীবনের স্বাদ।

সময় শোনে না কারো আর্তনাদ, বিনীত ভাষণ।
কুণ্ঠিত অস্তিত্বে প্রায় সকলেই মূঢ় প্রকাশক,
আমাকে বিক্ষত করে প্রত্যহের যে-অনুশাসন
পরিণামে কী আশ্চর্য আমি তারই নিষ্ঠুর ঘাতক।

নক্ষত্রের মৃত নদী নিশীথের ম্লান ছায়াপথে,
বৈদিক স্তোত্রের মতো মৃত্যুহীন আমি ষষ্ঠ ঋতু,
তুমিও প্রশান্ত হও শারীরিক আলোর জগতে
সমাপ্তির অন্ধকারে তৈরি হবে বিচ্ছেদের সেতু।

ভারতীয় সূর্যাস্ত

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

কত ছায়া এ-দেয়ালে, ছায়া পড়ে বুকে
নক্ষত্রের, টিকটিকির, কুসুমিত মালতীলতার ;
শুধু এক ছায়া আর কোনোদিন পড়ে না দেয়ালে,
কে আকাশ ? কে বাতাস ? পৃথিবী চক্কর দেয় দিল্লির বেতার।

গন্ধ দাও, পরিবর্তমান মেঘ, শান্ত বটগাছ,
পেয়ালা-পিরিচ ওগো, অমলেটে কিছু অলৌকিক !
যাতে ফিরে যেতে পারি পিপুলের গভীর কোটরে,
বুঝে নিতে পারি ফের আর্ষ দুই পাখির প্রতীক।

আণ্টুনি ফিরিঙ্গি তার অবিমল রক্তে করেছিলো
ভক্তিরস অনুভব ; অনেকেই উত্তরাধিকার
নিজের হ'লেও ভাবে এটা শুধু জাদুতে বিশ্বাস,
এই স্রোত একদিন দীপ্ত হ'য়ে বহমান ছিলো
বাউলের, বণিকের, অকপট চাষীর শিরায়,
স্থাবর কি অস্থাবর ডাক এলে ফেলে যেতো নম্র অনীহায়।

রাঙা অস্তে মশা ওড়ে ; ডেকচেয়ার—চুপ ক'রে একা।
হঠাৎ দেয়াল-ঘড়ি দূর কোনো পিতামহ ঘণ্টা দেয় তার ;
ধোঁয়া-ওঠা সূপ, রুটি রবটের মতো ভৃত্য আনে,
ছুরি-চামচের শব্দ ; এসো, দুঃখ—সে আসেনি আর।

কেউ নেই—
দরজার কারুকাজে পাখি ব'সে আলোছায়াতেই।
কে আমাকে টেনে নেয় বার-বার পিপুলের নিচে ?
রক্তের গভীরে বুঝি পত্রালির গোপন বিস্তার ;
ততই ছড়ায় তার ডালপালা বয়সের সূর্য যত ঢলে,
দৃশ্য ঘুম ধূমপান চলাফেরা করে অধিকার।

ব্যালেরিনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

দিনগুলো কোনোক্রমে কেটে যায়। অসহিষ্ণু ঋতু
উজিয়ে যুবক গেলো প্রীত নৌকা দূরতম জলে;
দূরতম জলে এক নাচঘর, শান্ত···নীল, মৃদু
ফুটে আছে—বৃষ্টির ফোঁটার মতো আশ্চর্য হিজলে।

রাত্রে কোয়ার্টেট, রাস্তা ··ওয়াল্‌ৎজের মাতাল জ্যোৎস্নায়
তুষারে আগুন ছোঁড়ে, রক্তে টলে ঘূরন্ত সংসার;
জলের বন্ধুকে আর এইখানে পাবে না ইচ্ছায়···
দিনগুলো দগ্ধ গান, বাসি···রুক্ষ, করোটির হাড়।

চতুর্দিকে চন্দ্রালোক। নষ্ট···ছিন্ন একার শরীর;
লজ্জার জটিল যজ্ঞে আমরণ শিথিল রমণী
অনিচ্ছুক নীবিবন্ধ খুলে দিলো। প্রিয় নৌকাটির
সন্ধান না-পেয়ে, ধূর্ত সর্বনাশে ভাসালো তরণী।

শিল্প তার খ'সে গেছে। বিনিদ্র মঞ্চের সব আলো
ভ্রূভঙ্গে স্ফূরিত ওষ্ঠে নির্বাপিত, অন্ধ হাহাকার;
প্রিয় নৌকা···প্রীত নৌকা! কেন তুমি দূর দেশ জালো
যখন রুধিরে চক্ষে মাল্য নেই, মাটি নেই তার।

নাচের পুতুল

(একটি ব্যালে-নাচের মেয়েকে)

কবিতা সিংহ

শুনে ও কটিতে শুধু সামান্য সাটিন
পৃথিবীকে ছুঁয়ে আছে দুপায়ের অগ্রভাগ তার
তাকে ঘিরে আলো ঘোরে জালে-পড়া শাদা মৌমাছি
চারপাশে রঙ্গমঞ্চে থমকায় কালো অন্ধকার।

মনে হয় পিঠে তার ডানা আছে কাচের পতাকা,
অথবা সে হাঁস এক উড়ে-যাওয়া আলোর পালক,
অস্থিহীন, অলৌকিক, দেহ তার উড়ন্ত বলাকা
উপরে জ্যোতির দিকে তার দুই বাহু উদ্দালক।

হীরক-কঠিন উরু অন্ধকারে জ্যোতি-সমকোণ,
কটিতটে বৃত্তচাপ, বাহু কাঁপে সেতারের তার;
তবুও নাচের চেয়ে অপরূপ নাচের উঠোন
কারণ শরীর তার উচ্চনাদ তৃষ্ণার ভৃঙ্গার।

নাচ শেষ হ'লে পরে ফিরে এসো, উইংসের অন্ধকার কোণ
যত কাছে যেতে পারে তত কাছে নিয়ে এসো মুখ;
বর্ণলেপে বিস্ফারিত নাচে দুটি মোহন নয়ন,
অন্ধকারে ডুবে গেছে উচ্চকিত বাহু, কটি, বুক,

নাচ-শেষে ফিরে আয়, নেচে ওঠে অপেক্ষার মন,
এতক্ষণে তোর নাচ ছাড়িয়েছে নাচের উঠোন।

দয়িতার প্রার্থনা

দিব্যেন্দু পালিত

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কোথায় পেলে !
করপুটে ধরো কামনার গাণ্ডীব ;
মহানামব্রত চিন্ময় দীপ জেলে—
অগ্নিবলয়ে বরতনু উদ্‌গ্রীব !

জিষ্ণু হাওয়ায় কুলাচার উড্ডীন,
মাঙ্গলিকের উচ্চারে নিস্পৃহ ;—
দৃষ্টান্তের সংজ্ঞায় সৌখিন—
কৌশলে জ্বালো শঙ্কার জতুগৃহ ।

সংগোপনের সহবাস অতিরিক্ত,
শ্রাবিত তথ্যে পুনরপি উৎসুক ;
ষষ্ঠ ঋতুর উদ্বাহে ধারাসিক্ত—
যতদূর যাই শরাহত কিংশুক ।

অসহিষ্ণুর সংগ্রামে উৎসাহ,
নেপথ্যে কেন, হে চতুর জাঁহাবাজ !
দুঃসহ প্রেম সুখ-অন্তর্দাহ—
অতঃপরের কাছে এসো, যুবরাজ ॥

কান্না

আর্তুর র‍্যাঁবো

পাখিদের ঝাঁক, পশুপাল, যত গ্রামীন যুবতী
দূরে, আমি নতজানু গুল্মবনে : গভীর গোধূলি
কবোষ্ণ সবুজ, হিম, নরম বাদামতরুগুলি
ঘিরেছিলো চতুর্দিক, তবে কিসে জুড়ালো তিয়াষ ?

কে দেবে তৃষ্ণার শান্তি, কৃশতনু ওই বেত্রবতী
মালঞ্চ নিষ্ফল, মৌন বনস্পতি, আচ্ছন্ন আকাশ !
সুখের আস্তানা ছেড়ে এই হলদে ভাঁড়, কী দুর্গতি,
ঘেমে উঠি যেই ওষ্ঠে স্বর্ণাভ পানীয়টুকু তুলি ।

একটু নত হই : যেন বিজ্ঞাপন শুঁড়ির দোকানে—
তখনই আকাশ জুড়ে প্রচণ্ড প্রলয় সর্বনাশা,
দেবতা দুর্বাসা-ক্রোধে শিলা ছোঁড়ে পুষ্করিণী-পানে ;
তৃষিত বালুকা-'পরে পানপাত্র স্খলিত—হতাশা—

রোদনে দেখেছি স্বর্গ, তবু কণ্ঠে অতৃপ্ত পিপাসা !

অনুবাদ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

হেমন্তের গান

পোল ভের্লেন

বিষাদ সুর গায়
কে যেন বেহালায়
সে কি হেমন্ত,
করুণ ক্ষতগুলি
হৃদয়ে ভ'রে তুলি,
ব্যথা নিরন্ত।

সময় বলে, যাই
বাতাস পেতে চাই,
প্রকৃতি পাণ্ডুর,
যে-দিন পলাতক
জমেছে তারই শোক
অশ্রুভারাতুর।

প্রবল খ্যাপা ঝড়ে
আমায় নিয়ে ওড়ে
কোথায়, হে বিধাতা,
জানি না কোনখানে
চলেছি কার টানে
যেমন ঝরা পাতা।

অনুবাদ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অবরুদ্ধ নায়ক

গোপাল ভৌমিক

সম্মুখে সমুদ্র নেই,
চিন্তার পাহাড়
উদ্যত ও প্রলম্বিত :
ঘাসে ঢাকা সমভূমি
নুয়ে-পড়া মানসিকতার
পরিচয়বাহী ব'লে
চিন্তা গড়ে
বিদ্রোহী প্রাকার।

যতই পাহাড় হই
যত করি আকাশ কামনা,
হৃদয় পায় না খুঁজে
শান্তি কিংবা মধুর সান্ত্বনা।
সে তার ধ্যানের শঙ্খে
বার-বার দিয়ে যায় ডাক
সে চায় সমুদ্র, শান্তি,
পাহাড় মাথায় তোলা থাক।

পাহাড়ে সমুদ্রে তবু
কদাচিৎ হয় দেখাশোনা ;
এক হাতে তরবারি
আর হাতে শান্তির সান্ত্বনা
নিয়ে তবু
দূর হ'তে দূরে পথ চলি,
পথ জুড়ে পড়ে আরাবলি।

অনুভব

প্রফুল্লকুমার দত্ত

কখনো জোয়ার আসে অদ্ভুত অস্বস্তিকর। আশ্লেষ-উচ্ছ্বাস
জীবনের—এ-মনের সমস্ত প্রান্তর জুড়ে বিষণ্ণ ঘোলাটে
নোনা মাটি ফেলে যায় : ধূসর প্রলেপ নিয়ে বহু কাল কাটে,
সাময়িক বন্ধ্য মনে সর্ববিধ ফসলের সম্ভাবনা নাশ।

আবার জোয়ার আসে! সেও প্রয়োজনহীন হয়তো জগতে,
অথচ এ-কবিমন চিরন্তন ব্যাধিগ্রস্ত ব'লে, স্বাভাবিক
যন্ত্রণায় তাকে চায় : বালুচরে সমাধিস্থ নির্জীব নাবিক
আবার ভাসায় তরী আবহমানের নম্র অনুষঙ্গী স্রোতে!

তোমার করুণা ঝরে, আন্তরিক প্রচেষ্টায়। দুর্দিনের ঋণে
আমার ডোবার পালা : বিভ্রান্ত জীবনময় বেদনা অগাধ—
উদ্ভিন্ন বীজের ভাবী ধারাটিকে তিলোত্তমা বানাবার সাধ
ব্যর্থ হ'লে, উন্মাদনা আমার সত্তাকে নেয় বিনামূল্যে কিনে।

তথাপি বাস্তববাদী তোমাদের যুক্তি, তর্ক এবং অন্বয়
সব তার ছিঁড়ে দিলে জান্তব বিলাপে ভরে সুরেলা হৃদয়।

দুটি কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অরণ্য

হরিৎ, স্বরাট বৃক্ষ ; গুল্মলতা প্রতিবেশী ম্লান।
কে এখানে মেঘ আসে—এই বনে যক্ষ কেউ নেই!
পাঁচটি ইন্দ্রিয় ওই প্রিয়তম নিয়তির পাশে
অবিচল থাকে, তাথে নিষিদ্ধ সূর্যের এক ব্যাপ্ত মহাদেশ
চতুর্দিকে ফুলে ওঠে রতিদক্ষ প্রবল কেশরে।

গাঢ় অন্ধকার, ঘোরে সম্পন্ন ময়াল, ছোটে ত্রস্ত হরিণীরা
প্রস্তুত মহার্ঘ ভোজে বাঘ দূর নদী দেখে আসে,
নদী শান্ত জলধারা ; কে তখনো পিছনে তাকায়
কোথাও নিসর্গ যদি পাহাড় চূড়ায় থেমে থাকে ;
—নীলাকাশ, পাখি যেন পাখি ডাকে পাখি ডাকে পাখি…

অকস্মাৎ তবু ফেরে বন
ফেরে নারী, রম্য পশু ; অজাতশিশুর গর্ভ ঢেকে রাখে শিলা,
দেবদারু-দৃশ্য ভরা আরক্ত কাঁটায় কাঁপে রেখার পাতালে,
বিশাল চুলের মসী অবলুপ্ত করে সব অধীন আত্মাকে ;
তখন কোথায় ফোটো, হে গোলাপ, আত্মীয় আমার!
—হেসে ওঠে নষ্ট হাওয়া ; শোনে নদী, স্তম্ভিত পর্বত ;
মেঘে কোন বার্তা আসে, বনে কেউ যক্ষ একা নেই ;

পাশাপাশি শুয়ে আছে গভীর নিঃসঙ্গ দুটি রাত্রির সন্তান।

নির্বেদ

সর্বজ্ঞ সময় থেকে সে আনে দুঃখের অধিকার।
ফোটায় দুর্লভ ধ্যানে মানবিক মুহূর্তের ফুল,
ঝ'রে যাবে জেনে তবু বসন্তসন্ধানী ব্যগ্র পাখির সংসার
তার কাছে রেখে যায় ফাল্গুনের প্রথম মুকুল।

অথচ তাকেও ঘেরে নৈয়ায়িক নীতির নির্বেদ,
চরিত্ররক্ষায় থাকে অন্দরমহলে পুরনারী।
সতর্ক কঙ্কণ যার শয্যাস্বর্গে দম্পতি-সময়
মেপে, শেষে ভোর করে এক ঘুমে প্রেম, শিল্প, স্নায়ুর সংবেদ।

তিনটি কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমার প্রস্তাব

আমার প্রস্তাব : এই রাতটাকে জালিয়ে দাও।
আমার প্রস্তাব : এদের, এই আপাত-অর্থহীনদের,
এই অন্ধকার আর হাওয়ার অভাবকে বাণী দাও।
আমার প্রস্তাব : আমার এই ঘরের মূঢ় কোণটাকে বকবকিয়ে
হঠাৎ পাগল ক'রে তোলে।

আনো অনেক শিশুর হাসি, বিচিত্র খেলনা,
অনেক উজ্জ্বল আলো, আনো আনন্দ।

আমার প্রস্তাব : ভুলতে দাও শীত, ভুলতে দাও
সর্বদাই কিসের একটা অভাব, ভুলতে দাও
না-জাগার না-ঘুমোতে পারার ক্লান্তি।

আমার প্রস্তাব : এদের জীবন দাও।

সে আমায় দিয়েছে

সে আমায় দিয়েছে এক আশ্চর্য আগুন—আমায় দিয়েছে সে
সেই আগুনে অনির্বাণ জলার মতো তেমনি বিরাট এক অন্ধকার।
তাতে প্রতি মুহূর্তেই খুলে গেলো আমার পথ, জ্ব'লে গেলো বুক।
তবু তাও শেষ নয়।

আমি বলি তাই তারি কথা কখনো চুপ ক'রে, কখনো গুমরে-
গুমরে, কখনো মরতে-মরতে, জ্বলতে-জ্বলতে। এই পাথেয় অশেষ,
এ আমায় মুক্তি দিয়েছে, দাস করেছে অসহ্য নিয়তির, এ আমার
মস্তিষ্ককে চিরবিমূঢ় ক'রে দিয়েছে একেবারে জন্মের মুহূর্তেই,
অবাধ্য আভায়, অকাট্য আঁধারে।

আমি কেবল ছুটবো, হাঁপাবো, মুঠো পুরে ভরবো অন্ধকার, ছুঁড়ে দেবো
আগুনে। আর আগুন লেলিহান হ'য়ে শত হস্ত প্রসারিত ক'রে
তাকে গ্রাস করবে অট্ট হেসে।

এই পোড়া মাটিতে যে-ফুল ফোটাই আমার বেদনায়,
সে আগুনের ফুল—টেক্কা দেয় কোটি যোজন দূরের
তারার সঙ্গে। আকাশ তাকে দেখবার জন্যে হয়েছে পাষাণ-
শতদল—মুখ ঘুরিয়ে বিস্ফারিত সে চেয়ে আছে তলার
দিকে, বোঁটা তুলে অদেখা শূন্যে।

যাকে বাঁধতে চাই, ভালোবাসতে চাই যার রূপ গ'ড়ে তুলি
মনে-মনে, তাকে বৃথাই ডাকতে চাই একটু মুহূর্ত ধ'রে,
এই অনন্তে জলন্ত রাতের কারখানায়।

নয় বাঁধানো ছবিকে

নয় তোমার বাঁধানো ছবিকে, যা টাঙানোই আছে। তোমাকে, তোমার
জলন্ত তুমি-কে। আর এই তো আমি।

এই আমার চোখ যা তোমায় দেখেছে, এই আমার হাত যা উদ্যত
তোমার হাতের দিকে, এই আমার বুক যার ক্ষত ফুল হ'য়ে ফুটে আছে।

এই তো আমি। দেখলে না? তুমি দেখলে শুধু অন্ধকার? শুধু তোমার ভয়,
তোমার ঐ তুচ্ছ সংশয়? তুমি ফিরে গেলে?

তোমার ফেরার পথে আবার হাওয়া ওড়ালো শাড়ির কোণ, দূরের
মেঘের মতো পাহাড় আবহ-সংগীতে যাত্রার আরো একবার তুললো
মূর্ছনা। তুমি পৌঁছলে না মন্দিরে এসেও, আরো একবার তুমি ছুঁলে না
যাকে ছোঁওয়ার ছিলো, দেখলে না যাকে দেখতে তুমি এলে, যে তোমায়
দেখেছিলো।

দেখলে শুধু অন্ধকার, শুধু তোমার ভয়—তুমি ফিরে গেলে।
জানি আমার অনিদ্রার, না-পাওয়ার আরো এক রাত্রি দীর্ঘতর হ'লো।
জানি কাল সকালে ভিক্ষুক আবার আসবে দ্বারে, দরিদ্রের অশিষ্ট
শিশু রাস্তায় কাগজ কুড়োবে। জানি আবার দুপুর হবে, সন্ধ্যা হবে,
রাত্রি হবে।

এই হওয়ার অনিবার্য তাড়নায় আমার নির্জন কোণে আমিও নিরন্তর হবো,
তুমি হবে অবিরাম তোমার নিরুদ্দেশ, যেমন ঐ অশথ-চারাটাও প্রতি মুহূর্তে
হবে, দিনে-দিনে বুড়ো হ'য়ে অকৃতার্থ পাষাণ হ'য়ে যাবে সে একদিন—
অবশেষে যতদিন না হয় পৃথিবীর প্রথম সকাল হ'তে যা হওয়ার আছে।

জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময় দত্ত

একজনের মৃত্যুর আঘাত সামলে ওঠার আগেই অন্য জন মারা গেলেন; শুধুমাত্র মৃত্যুর তারিখে তাঁরা সন্নিকট; নিতান্ত অর্থহীন অযৌক্তিক এই সংযোগ। আর মৃত্যুতেও কি তাঁরা ভিন্ন নন? অকালমৃত্যু দুজনেরই, এবং কেউই সম্ভ্রান্ত, তৃপ্ত গৃহস্থের মতো সম্পত্তির নিপুণ ব্যবস্থা ক'রে, শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনবর্গকে পরামর্শ ও সন্তপ্ত আত্মীয়গণকে শোকপ্রশমনের উপদেশ দিতে-দিতে পরলোকের উদ্দেশে যাত্রারম্ভ করেন নি। এঁদের মৃত্যু কোনো শীতল প্রলেপ, শান্ত সমাধি, পরম সমাধান নয়; এ হ'লো মুদ্গরের আঘাত, উৎপাটন, বিচ্ছেদ, যতি। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মৃত্যু যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিকল্পিত। জৈন তীর্থংকর যেমন খাদ্য বর্জন ক'রে নিজেকে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারেন, তেমনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অস্ত্রে ধীরে-ধীরে বিষ সঞ্চয় ক'রে নিজেকে হত্যা করলেন। আর জীবনানন্দের মৃত্যু হ'লো অকস্মাৎ; এটুকু অন্তত বলা যাক যে এ-মৃত্যু এমনকি তিনিও আকাঙ্ক্ষা করেন নি। দলিত উদ্ভিদের মতো তিনি শুধু আঘাত গ্রহণ করলেন; ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করলো, এই নিতান্ত নিরুদ্যম বোধসর্বস্ব কোমল মানুষটি সে-আঘাত সহ্য করলেন শুধু। জীবনানন্দ সারা জীবন পালন ক'রে গেলেন যেন কোনো-এক নিরভিমান বিধবার ব্রত। শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের অত্যাচার, দারিদ্র্য, পাঠকসমাজের উপেক্ষা, সব-কিছু শুধু সহ্য ক'রে গেলেন; অথচ কোথাও একবিন্দু তিক্ততা রেখে গেলেন না। কোনোদিন কোনো তর্কে প্রবৃত্ত হন নি, বিদ্বেষ করেন নি কাউকে, শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মঠবাসী সন্ন্যাসীর চেয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের চাইতে সুদূর। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন যেন এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড। লোকসংসার দগ্ধ ক'রে যখন আর-কিছুই অবশিষ্ট রইলো না তখন তিনি নিজেকে আহুতি দিলেন।

একজন এমন লাজুক, সর্বদাই বিনয়ে ও আত্মসংশয়ে এমন আনত,

সামাজিক আলাপে এমনি অক্ষম যে পরম হিতৈষী ভক্তের কাছেও তাঁর সঙ্গ ছিল শ্বাসরোধকর। আর অন্যজন অজস্র কথা বলতেন, অনায়াসে নিষ্ঠুর হ'তে পারতেন, সকলকে অবাক ক'রে দিতেন তাঁর সরল নির্লজ্জতায়। আগন্তুকের আক্রমণে পশু কিংবা ত্রস্ত শিশুর মতো নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করতেন জীবনানন্দ দাশ, আর বালকের মতো নির্ভয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আকৃতিতেও ভিন্ন ছিলেন তাঁরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ের রং কালো, বাঙালির পক্ষে তাঁর দৈর্ঘ্য লক্ষণীয়, বড়ো, বড়ো পা জীর্ণ জুতোয় আবৃত। ঘরে ঢুকতেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো হুড়মুড় ক'রে। কেউ যে এমন ত্বরিতগতিতে এতো কিছু এমন অনায়াসে (এবং নিজের অজ্ঞাতসারে) সংঘটিত করতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ ও নির্গমন না-দেখে থাকলে তা নাকি কল্পনা করা যায় না। আর জীবনানন্দের ভঙ্গি ছিল ভিতু, বড়ো-বড়ো চোখ সর্বদা বিস্ময়ে বিস্ফারিত; প্রশস্ত কিন্তু অলস তাঁর খর্বকায় শরীর।

ভিন্নতার তালিকা দীর্ঘতর করা সহজ কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। একজন শেষ জীবনে সাহিত্যকে রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন, অন্যজন রাজনীতিকে সাহিত্যের। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে সমকালীন ঘটনার যতো উল্লেখ আছে, প্রথম দিকের কবিতায় তার শতাংশও নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র শেষ জীবনে একজন সাহিত্যিককে তাঁর উপন্যাসের নায়ক করলেন। কিন্তু এ-সাহিত্যিক যে-কোনো গণপ্রচারসভার সম্পাদককেও টেক্কা দিতে পারেন, তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি এমন টনটনে, তাঁর চিন্তা এমন বুলিসর্বস্ব। আর জীবনানন্দের রাজনীতি এক বায়বীয় লোকে সংঘটিত হয়; "স্তালিন-নেহেরু-ব্লক" মানুষ নন, প্রতীকও নন, শুধুমাত্র শব্দবিশেষ; এ-কালের রাস্তায় হাঁটলে এই সব সাইনবোর্ড চোখে পড়ে কিন্তু অনুপম ত্রিবেদী অথবা জীবনানন্দের হৃদয়ে এরা অর্ধসত্যের অধিক স্বীকৃতি পায় না।

কিন্তু এই নামগুলি ছাড়াও আরো আছে। হয়তো স্তালিন-নেহেরু শুধু

নাম, "রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়" তাঁর হৃদয়ে সাড়া তোলে। শুধু সাড়া নয়; শেষ বয়সে এইগুলিই জীবনানন্দের প্রধান ভাবনা হ'য়ে উঠলো; যে-কবি অলস গ্রাম্য ভাঁড়ের মতো সব-কিছু ভুলে মদের পাত্রে, ঘুমে, মৃত্যুতে শান্তি খুঁজেছিলেন, তিনি "বাংলার তেরশ চুয়ান্ন সালে" এসে থমকে দাঁড়ালেন, প্রত্যক্ষ করলেন রক্তাক্ত পৃথিবীকে, উপায় খুঁজলেন পরিত্রাণের।

অবশ্য জীবনানন্দ যৌবনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই এমন এক তীব্র বেদনায় ভরা যার নাম আমরা জানি না, শুধু যখন মাঝে-মাঝে "উটের গ্রীবার মতো" আমাদের মনের জানালায় হানা দেয় তখন তার প্রভাব অনুভব করি। সেই পরম বিষণ্ণ উট আবির্ভূত হ'লে দেহধারণ অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সে-বিষাদে কাতর হ'য়ে গ্রাম্য কবি মদের পাত্রে আরাম চেয়েছিলেন, ব্যথায় অবশ হ'য়ে লাশকাটা ঘরে শান্তি খুঁজেছিলো আর-একজন, আর যখন জৈব প্রেরণা এবং প্রবৃত্তির চাইতে চৈতন্যের ভার বেশি হ'য়ে গেলো, যখন "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক" বেসামাল হ'য়ে উঠলো, তখন এমনকি চতুর অনুপম ত্রিবেদীরও মৃত্যু ছাড়া গতি রইলো না। আর যে কবি অনেক "রাজ-নীতি রুগ্ন নীতি মারী" প্রত্যক্ষ ক'রেও বিশ্বাস হারাননি কারণ তিনি বুদ্ধকেও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি ১৩৫৪ সালে ঠেকে যেতে চান একই বেদনায় কাতর হ'য়ে। কবিমাত্রেই দূরদ্রষ্টা ও কোমলচিত্ত; তাই, কোনো বিস্মৃত অতীতে কিংবা দূর ভবিষ্যতে, দূরদেশের কোনো অচেনা ব্যক্তিও যদি আঘাত পান বা পেয়ে থাকেন তবে তিনিও আহত হবেন। বেঁচে থাকে তারা "যারা কিছুই সৃষ্টি করেনি," প্রতিদিন "তাদের অবিকার মন শৃঙ্খলায় জেগে ওঠে কাজে।" বেঁচে থাকে নীচ প্রাণী, জেগে থাকে পেঁচা। অথচ আশ্চর্য এই যে অনুপম ত্রিবেদীদেরই শুধু মৃত্যু ঘটে; বিস্মৃতিপ্রার্থী কবির চেতনার জ্বালাও জুড়োয় না, হৃদয়হীন প্রাণীদের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বেঁচেও থাকেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জীবনানন্দ উপলব্ধি করলেন বেঁচে থাকার প্রেরণার সঙ্গে চৈতন্যের বিরোধ আছে। এ-বিরোধ প্রাচীন, এবং অলৌকিক মধ্যস্থতা বিনা

এ-বিরোধের সমন্বয় প্রায় অসম্ভব। অর্জুনের অবশ হাত থেকে গাণ্ডীব খ'সে পড়েছিলো; দেবতা তাঁকে সাহায্য না-করলে আবার সে-ধনুক হাতে তুলে নেবার সাধ্য এমনকি তাঁরও ছিলো না। আর সেই প্রেমিক কিশোর, বিবেক-হীন সুন্দর গ্রীক দেবীগণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলিতে ভর করলেও যাঁর হৃদয় মৃত্যুকে ভুলতে পারেনি, সেই কীটস বেঁচে থাকার জন্য কতো কৌশলই না অবলম্বন করেছিলেন! আলস্য, বিস্মৃতি, সৌন্দর্য—নিশ্চেতনায় অন্তত নিশ্চিন্ত করুক, ভুলিয়ে দিক তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু, তাঁর নিজের অচিকিৎস্য ব্যাধি, তাঁর অতৃপ্ত প্রেমের তীব্রতা। কীটস মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রেমকে পরিপূর্ণ, জীবনকে অনন্ত ও মৃত্যুকে উষ্ণরূপে দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে-মুহূর্ত ক্ষীণ। মহাকাব্যের প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'লো, র'য়ে গেলো শুধু শান্তির আকৃতি, সমাধানের আভাস। জীবনানন্দ যখন সমন্বয়সাধনে উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর হাতে ছিলো দীর্ঘ পনেরো বছর, আর পাথেয় ছিলো পয়ার ছন্দ এবং প্রায় জন্তুদের মতো জাগ্রত ইন্দ্রিয়। জীবনানন্দ অস্থির থেকে অস্থিরতর হ'য়ে উঠলেন। শেষ যৌবনে দেখেছিলেন অভিভূত চাষা ডিনামাইটির স্তূপের উপর ব'সে পৃথিবীর অনাদি তামাসা দেখছে; দেখেছিলেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে পৃথিবী প্রবেশ করছেন। কিন্তু তখনো অত্যন্ত বেশি বিচলিত হননি; "আবহমান" কবিতাটির অন্তত প্রথম অংশে মিলগুলি পংক্তির শেষে বসানো, আর ত্রিলোকধ্বংসের ছবিও ("বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে"···) কেমন ঘরোয়া। কিন্তু ক্রমে তিনি অধৈর্য হ'য়ে উঠলেন, অনুপম ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর আত্মসংবরণ পীড়াদায়ক মনে হ'লো। এর পরের কবিতা কবিতার খোসায় মোড়া ইতিহাস, দূরদর্শন, জীবনবিদ্যা, চৈতন্যহরণী শিকড়, নির্বিবেক-করণী বটিকা, আশাসঞ্জীবনী সুরা, সান্ত্বনা, সেবা। একযোগে সব-কিছু হ'য়ে উঠলো, কবিতা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যে হয়তো কবিতার চাইতেও মহৎ। ধীর এবং আত্মবিশ্বাসী কোনো সদাপ্রসন্ন চিকিৎসক তাঁর প্রাণপ্রিয় কাউকে অচিকিৎস্য এবং অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কোনো ব্যাধির দ্বারা কবলিত জেনে হঠাৎ শোকে অধীর এবং যুক্তিহীন আশায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, যেমন হঠাৎ

তিনি তাঁর এতকালের আশ্রয়, তাঁর প্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্রে সংশয়ী হ'য়ে বিশ্বাস করতে পারেন স্বপ্নাদ্য ভেষজ বা গুরুপ্রদত্ত মাদুলিই ভালো, বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজ মন্ত্রোচ্চারণে যেমন তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তেমনি জীবনানন্দও এক সময় শোকে ব্যাকুল হ'য়ে কবিতাকে পরিহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

"পুতুলনাচের ইতিকথা"তেও মানুষেরা শুধু অভ্যাসে সচল। যে-মানুষ জীবনকে মায়া ব'লে মনে করেন এমনকি তিনিও মৃত্যুকে ভয় পান; শুধু তিনি নন, আমরা সবাই অন্ধকার পথে লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলি। এবং এমনকি আত্মহত্যাও মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অসহায় মানুষের সেই একটিমাত্র স্বেচ্ছাচার, স্বভাবকে পরাজিত করবার তার সেই একমাত্র উপায়কে নিষ্ঠুর লেখক কেড়ে নিলেন। "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় এক অন্ধ শক্তি যাদবের নিজের ও তাঁর ভক্তদের মন অধিকার করলো। সে-শক্তির বাহন গুজব, খাদ্য মানুষের মন, ক্ষুধা অপরিমেয়। সারা গ্রাম, এমনকি সরকারি কর্মচারী ও শশী ডাক্তার, এক দুর্বার প্লাবনে ভেসে গেলেন। এই যুগ্ম-আত্মহত্যা, এই হৃদয়হীন, নাস্তিক মৃত্যু ও পরম সতীদাহ রোধ করে সাধ্য কার? সারা পৃথিবীর সাহিত্যে যাদবের আত্মহত্যার মতো নিষ্ঠুর, রোমাঞ্চকর ও বিশ্বাসনাশক ঘটনা বিরল। "The Possessed" উপন্যাসে ডস্টয়েভস্কি শাটভকে হত্যা করেছিলেন, তার প্রেমকে করেন নি; কিরিলভকে হত্যা করেছিলেন, তার দেবদুর্লভ ইচ্ছাশক্তিকে নয়। শাটভ ও কিরিলভ ঋষি, দেবদূত বা দেবতার চেয়েও গৌরবময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে তার চৈতন্যের অধিকারটুকুও দিলেন না। এবং শুধু মৃত্যু নয়, জন্ম ও জীবনকেও তিনি সেই অন্ধ পশুশক্তির প্রকারান্তর ব'লে চিত্রিত করলেন। যামিনী কবিরাজের বউ যে-শিশুকে গর্ভে ধারণ করলো তাও তো তার কুড়িয়ে-পাওয়া—যেমন সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো শ্রীনাথের মেয়ের হারানো পুতুল। বেঁচেই বা ছিলো কেন? সৌন্দর্য তার হরণ ক'রে নিয়ে গেলো রোগে, তবু দেখা গেলো গোলাপ তার কাছে ফিরে এসেছে জৈব প্রয়োজনে। এমনকি প্রেম এ-জগতে বিকশিত ও বিনষ্ট হয়

কোনো সচেতন শক্তির ইচ্ছায় নয়; উদ্ভিদের মতো মানুষেরও ঋতুসমাগমে অঙ্কুরোদ্গম হয়, প্রেম নামক সেই ঋতুপ্রাণ মুকুল বসন্তে যেমন বিকশিত হয়, কাল অতীত হ'লে ঝ'রেও যায়। শুধু কি প্রেম? মানুষের চেতনা যেন এক ছাঁকুনি মাত্র, কোনো-এক আদিম কটাহ থেকে উত্থিত কালো ধোঁয়া তাতে শোধিত হ'য়ে বাইরে নির্গত হয়। এক নিশ্চেতন শক্তির আলোড়নে যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা আমাদের মনের তটে আছড়ে পড়ে, আমাদের হৃদয়েও কম্পন ওঠে। সে-কম্পনকেই কখনো সাধ ক'রে বলি প্রেম, কখনো সভয়ে চিনি বৈনাশিক ব'লে। হিংসা অথবা লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রেম কিংবা বেঁচে থাকার সাধ—সবই আমাদের নাগালের বাইরে। আর, এই নিশ্চেতন নিষ্ঠুরতা দেখে আমরা যতটা বিচলিত হই, তার চেয়ে অবাক হ'য়ে যাই লেখককে নির্বিকার দেখে। কেমন যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছেন তিনি, আত্ম-গোপন করেছেন এমন এক সুদূর লোকে যে মনে হয় তাঁর কল্পনার শিশুদের চীৎকার সেখানে তাঁকে স্পর্শ করছে না; তাঁর উপন্যাস যেন স্বতই গড়িয়ে চলে তাঁর সাহায্য বিনা। কেমন বাস্তব, নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক তাঁর লেখার ভঙ্গি। "পুতুলনাচের ইতিকথা"র ঢংটি যেন লেখকের আত্মরক্ষার বর্ম। তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে বেশিক্ষণ তাকালে, তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হ'লে তিনি উন্মাদ হ'য়ে যাবেন। আর বেঁচে থাকতে হ'লে ভুলে থাকার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, শশী ডাক্তারের মতো ধীরে-ধীরে ক্ষ'য়ে যাবে প্রেম, পৃথিবীকে বদলাবার ইচ্ছা, কল্পনা, মনুষ্যত্ব। উপন্যাসের গোড়ায় বজ্রাহত মানুষটির মৃত্যুতে শশী যতটা বিচলিত হয়, যাদবের ইচ্ছামৃত্যুতেও ততটা হয় না। ক্রমে-ক্রমে কুসুমের প্রেম যেমন শুকিয়ে যায়, লেখকও উপন্যাস থেকে সজল, সরস ও প্রাণবন্ত সব-কিছু শুষে নেন। তা না-হ'লে কি আমরা শশী ডাক্তারের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারতাম? না পারতেন লেখক স্বয়ং? অথচ পাঠকও মানুষ মাত্র; যখন জীবন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অভ্যাস ব'লে মনে হ'তে থাকে তখন ইচ্ছা করে লেখক অন্তত একবারের জন্য নির্বিকার দ্রষ্টার পদ ত্যাগ ক'রে ব্যথিত মানুষ হ'য়ে উঠুন।

এবং ঈশ্বরের মতো, নিষ্ঠুর লেখকও কি এক সময় তাঁর নিজের জগৎ অবলোকন ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে যান নি? তাঁর কুসুম, পশুদের মতো সরল, চৈতন্যের ক্লেদ ও ভার থেকে মুক্ত, স্বভাবসর্বস্ব নিষ্পাপ কুসুম যখন নিজেকে শশীর কাছে দান করলো তখন কে যেন ব'লে ওঠে: কুসুম, কুসুম, তোমার কি শুধু শরীর আছে, মন নেই? কুসুমকে, ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠুর, নিশ্চেতন জগৎকে, এ-প্রশ্ন কে করে? শশী? উপন্যাসে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই, তবু বোঝা যায় বক্তা শশী নয়। আমাদের রুদ্ধ মনের আক্ষেপে এই একবারের জন্য যোগ দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দুজনেই যৌবনে এমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সহনীয় নয়। মানুষকে প্রকৃতি এমন দুর্বল ক'রে গড়েছেন, এমন ক্ষীণ তার ইন্দ্রিয়, এমন কাতর তার শরীর যে এমনকি জড়প্রকৃতির কতটুকু সে অনুভব করতে পারে? আমাদের শরীর যতটা গ্রহণ করে বর্জন করে তার চেয়ে বেশি, আমাদের হৃদয় ভুলে থাকে যতট অনুভব করে তার ক্ষীণাংশ; আমরা তৃপ্তিতে বেঁচে থাকি আমাদের অন্ধতার সুযোগে। আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু আসন্ন, অর্বুদ শতক আগে নির্বাপিত নক্ষত্রের প্রেত প্রতি রাত্রে আকাশে হানা দিচ্ছে, কাল প্রাণীগণকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে ক্রমাগত রন্ধন করছে তবু আমরা ফুর্তিতে মেতে আছি বিস্মরণ নামক সব-জ্বালা-জুড়োনো প্রলেপের সাহায্যে। জীবনানন্দ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করলেন; এমনকি কমলালেবুর মধ্যে বধ্য পশুর প্রাণ ভ'রে দিলেন; হরিণীকেদিলেন আর্ত প্রণয়িণীর হৃদয়। এর পর আমরা কী কৌশলে তাদের আর্তনাদ না-শোনার ভান করতে পারি? আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেড়ে নিলেন প্রত্যেকের প্রাণ। জীবনানন্দের কল্পনায় সমস্ত প্রাণী ব্যথায় বিহ্বল, মোহ্যমান; যেমন গুবরেপোকার ডানা দেখা যায় না—এতো দ্রুত তার পাখার কম্পন—জীবনানন্দের প্রাণীরা তেমনি এমন তীব্র যন্ত্রণায় কাতর যে তাদের জড় ব'লে ভুল হয়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলগুলিকে জীবন্ত ব'লে মনে হ'লেও তাদের নাচায় কোনো-এক নিশ্চেতন শক্তি। বিপরীত এই দুই

অভিজ্ঞান? আসলে বিপরীত নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক মানুষেরা জীবনানন্দের কবিতায় অন্য ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। যে-মাছি "রক্ত ক্লেদ বসা থেকে উড়ে যায়", তিনজন ভিখিরি, সেই প্যাঁচা, এরা সবাই তো প্রকৃতির বিবেকহীন সন্তান। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তুল্য এক জগৎ'দর্শন ক'রেই তো জীবনানন্দের নায়কেরা ব্যথায় অবশ হ'য়ে জড় রূপ প্রাপ্ত হন। দুজনের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকু যে শশীর মুক্তির আকৃতিকে হৃদয়হীন সমাজ বিনষ্ট করলো: জীবনানন্দের কবিতায় হ'লে সে হয়তো হৃদয় হারাতো না, তার বদলে লাসকাটা ঘরে সেঁপে দিতো তার প্রাণ।

এমন নিষ্ঠুর জগৎ যাঁরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের চেয়ে সহৃদয় আর-কোনো লেখক আমাদের ভাষায় লেখেন নি। শরৎচন্দ্রের সমবেদনা প্রধানত বালক ও স্ত্রীজাতির জন্য; তাঁর ব্যথার কারণ সামাজিক বা পারিবারিক দুর্যোগ, সে-দুর্যোগ দূর হ'লেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা সুখী গৃহস্থে পরিণত হয়। আর রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি ঈশ্বরের সপক্ষে; তিনি চরম আঘাতকেও পরম করুণা ব'লে মেনে নেন। তাঁর কল্পনায় ঈশ্বর মানুষের এমন ঘনিষ্ঠ যে যদি তাঁর স্ত্রীপুত্রধন সবই যায়, তবু তাঁর ঈশ্বর থাকেন। জীবনানন্দের বিষণ্ণ উট, নৈরাশ্যের, নিরীশ্বরের যে বার্তাবহ, সে কখনো রবীন্দ্রনাথের জগতে হানা দেয় না।

সত্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে তার জান্তবতা লুপ্ত হয়, বুদ্ধির অ্যাসিডে ক্ষ'য়ে যায় তার বিকট গ্রীবা, অশোভন কুঁজ,—সে পরিণত হয় এক বিদগ্ধ প্রাণীতে। জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় —এঁরা সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় সরল নিষ্পাপ শিশুমাত্র। সুধীন্দ্রনাথ আবেগের চেয়ে শৃঙ্খলাকে, আত্মবিস্মৃতির চেয়ে নিজের উপর প্রভুত্বকে বেশি কাম্য ব'লে মনে করেন। তাঁর কবিতার যে-লক্ষণ আমাদের সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, মিলগুলির বিস্ময়কর অনিবার্যতা, মিলের সংখ্যা, অপ্রত্যাশিত শব্দের যথোচিত ব্যবহার। আর জীবনানন্দ করে-পরে ঝড়ে-নড়ে ধরনের মিলেই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁর শব্দসংখ্যা কী পরিমিত এবং অধিকাংশই দেশজ;—এবং সেই এক পয়ার ছাড়া আর কোন ছন্দ তিনি স্বস্তিতে ব্যবহার

করেছিলেন? তাঁর কবিতা আমাদের মুগ্ধ যত না করে, দীর্ণ করে তার চেয়ে বেশি; তারিফ যত না করি, তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা পাই।

স্বভাবকবি বলতে যে-অর্বাচীন, উন্মাদ, বন্য প্রতিভার ছবি ভেসে ওঠে তা যতই অলীক হোক, এঁদের দুজনের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। পুরোপুরি মিল নয়,—কে কবে মাতৃগর্ভ থেকে মহান শিল্প সৃষ্টি করতে শুরু করেছে? শিক্ষা বিনা এমনকি সহজ অথবা স্বাধীন হওয়াও যায় না; স্বতঃস্ফূর্তির অভিনয়ও আসলে কৌশল; কৃষক-কবি সবচেয়ে বেশি প্রাচীনপন্থী—অর্থাৎ অ-স্বাভাবিক; —লোকসাহিত্য কী অপরিবর্তনীয়—এবং সব দেশের লোকসাহিত্যই কেমন একই রকম,—সুতরাং গ্রামীন-শিল্পীর গতানুগতিকতা ছাড়া গতি নেই। অন্য কবিদের মতো জীবনানন্দও শুধু ক্রমে-ক্রমে সহজ হ'তে শিখেছিলেন; "রৌদ্র ঝিলমিল মধ্য এশিয়ার নীল"-এর কৃত্রিমতা বর্জন করতে তাঁকেও শিখতে হয়েছিলো। "জননী"ও শিক্ষানবিশের লেখা উপন্যাস এবং যদিও জীবনানন্দের কবিতা প'ড়ে মনে হয় তিনি গুরুমন্ত্র বিনাই তাঁর কাব্যমার্গ বেছে নিয়েছিলেন, মনে হ'তে পারে কাউকে অনুকরণ না-ক'রেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন, আসলে এমনকি তিনিও অন্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে; তরুণ জীবনানন্দের উপর প্রভাব পড়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের। সত্যেন্দ্রনাথের তরলতা ও অতিলালিত্য, বা নজরুলের স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনানন্দের কী মিল থাকতে পারে? কিন্তু অসম্ভব উৎস থেকে অভাবনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করার ক্ষমতার নামই বোধ হয় প্রতিভা। এঁদের দুজনের মধ্যে যা স্থূলভাবে উপস্থিত তা জীবনানন্দ পরিশোধন করলেন—রূপান্তরিত করলেন মধ্যপ্রাচীকে, তার আপেল, আঙুর, নাসপাতি, তার নরম গালিচা আর সজল তরমুজ নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন বুদ্ধিকে, সভ্যতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, আর জীবনানন্দ বরণ করলেন দূরদ্রষ্টা সাধকের পথ। দুজনে যে দুই ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কবিতা সম্পর্কে তাঁদের দুই বিখ্যাত উক্তিতে: "সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি এবং "মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার

অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।" জীবনানন্দের উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে এতই সত্য যে শুধু তা-ই বলা যদি জীবনানন্দের উদ্দেশ্য হ'তো তবে না-বলাই হয়তো ভালো ছিলো; আর সুধীন্দ্রনাথের ঘোষণাটিকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না, কেননা তাঁর কাব্যকলা স্পষ্টতই মালার্মে-পন্থী নয়। আসলে, জীবনানন্দ রোমান্টিক ধর্মের মূল বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করেছিলেন —শিক্ষা নয়, প্রেরণা কবিতার জনক; কবিব্রত কেউ ইচ্ছে ক'রে গ্রহণ করে না, এক নিষ্ঠুর ডাকিনী কারো-কারো উপর ভর করে; কবিতায়, কবির নয়, সেই আশ্রয়ী প্রেতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, কারণ কবিত্ব এক অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, অপরিত্যাজ্য সৌভাগ্য; শিক্ষিত সবাই হ'তে পারে কিন্তু কবি শুধু তিনি, যাঁর উপর দেবী ভর করেন। আর সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে প্রতীকীবাদের বুদ্ধিবিরোধী, এমনকি প্রতীকবিরোধী রূপটিকে উপেক্ষা করেছেন, তিনি ইচ্ছে ক'রে লক্ষ করেননি যে মালার্মের শব্দব্যবহার যথার্থ তো নয়ই, যথোচিত শব্দ যাতে ব্যবহার করতে না হয় তারই জন্য মালার্মের সব পরিশ্রম। সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে সেই ঈশিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যা তিনিও কামনা করেন। প্রেরণানির্গত, অসংবরণীয়, অসংশোধিত কাব্যস্রোতের বাহক হ'তে তিনি চান না। নিপুণতা চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন "স্বায়ত্তশাসন", কবিতার উপর স্রষ্টার কর্তৃত্ব চেয়েছেন।

এই দুইজন সমবয়স্ক কবি (জীবনানন্দ বিশ শতকের এক বছর আগে জন্মে-ছিলেন—এক বছর পরে সুধীন্দ্রনাথ) দুই বিপরীত আদর্শকে মূর্ত করলেন। জীবনানন্দ ব্লেক, হোল্ডারলীন, কীটস এবং ইয়েটস এর মতো দিব্যদর্শী; সুধীন্দ্রনাথ কালিদাস ও হরেস, এবং ভালেরি-কল্পিত লা ফঁতেন-এর মতো সচেতন। যে-জীবনানন্দকে মনে হয় এত দিশি, তাঁর কাব্যের মূল কোনো ভারতীয় কবির কবিতায় পাওয়া যাবে না; সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের কবিতাকে তিনি শুধু ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের অনুকরণ করেন নি। তাঁর আদর্শ সেই সব বিদেশী সাধক-কবি যাঁরা পরম নিপুণ, যাঁরা এক দীর্ঘ যদিও বেসরকারি ঐতিহ্যের বাহক, কিন্তু যাঁদের রচনার কৌশলই এমন যে মনে হয়

তা রচিত নয়, তা শুভক্ষণে প্রাপ্ত। আর সুধীন্দ্রনাথ, যাঁর ফরাশি-জর্মনে পারদর্শিতা বহুবিদিত, যাঁর প্রতীচী প্রীতি শুধুমাত্র সাহিত্যে আবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও যার প্রভাব লক্ষ করা যায়, যাঁর কাব্যের নায়িকা বিদেশিনী এবং কাব্যগুরু মালার্মে, তার কবিতা একেবারেই ভারতীয় এবং তিনি স্বীকার করেছেন তার কাব্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত।

তবুও, জীবনানন্দ বিদেশ থেকে যতো কিছুই আহরণ ক'রে থাকুন, যতোই তিনি অনুকরণ করুন অপরকে, তাঁকে মনে হয় কোনো-কোনো বিষয়ে শিশুর মতো সরল, শিশুদের মতো অশিক্ষিত। এমন হ'তে পারে যে তাঁকে এতো নতুন, এ-রকম স্ব-প্রসূত মনে হবার কারণ এই যে তাঁর আদর্শ অপর কোনো ভারতীয় কবি নন—মহাভারত এবং কালিদাসের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর কাব্যে—অথচ তাঁর সারল্য অভিনয় নয়। তিনি নিজেকে ঘোষণা করতে চাননি ব'লেই দেবী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজেকে অতো সহজে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এত স্বচ্ছ, এমন তিমিরভেদী তাঁর দৃষ্টি, তার কারণ তিনি অহমিকাহীন। কত নিচু প্রাণী তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কতো সূক্ষ্ম বস্তু, কতো ঘোর রহস্য হয়েছে উদ্ঘাটিত। তার কারণ তিনি শ্রদ্ধাভরে এমন কি মাছির চরণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অবনত করেছিলেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো চেতনাতে অন্য কোনো কিছুর বর্ষণ ধারণ করার জন্য সৃষ্ট পাত্রবিশেষ। তাঁর মধ্যে অহমিকা তো নেইই, মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর বিনয় প্রায় আত্মবিলোপকারী। এঁদের দুজনেরই শিল্পের মধ্যে মাঝে-মাঝে এমন এক মধুর বালক-মন প্রকাশ পায়, যা দেখে আমরা—বিদগ্ধ, সুরুচিকাতর, আত্মসচেতন পাঠকেরা—আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। যখন জীবনানন্দ, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্রয়েড ডারুইনের উল্লেখ করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় নতুন পুতুল পেয়ে বালিকার মতো তাঁরা চমৎকৃত হচ্ছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা দেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে এ-জীবন তিনি জানেন না, কিন্তু খেলার ঘরে বন্দী শিশুর মতো তিনি দেয়ালের ওপারের জগৎকে ইচ্ছেমতো ভরিয়ে তুলছেন। জীবনানন্দের "সকলের আগে নিজে অথবা নিজের-নিজের নেশন"

মনে করিয়ে দেয় কোনো গ্রাম্য সাধকের বাচনভঙ্গি; যামিনী রায় যেমন মানুষজাতিকে বোঝাতে "হিউমন" ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন না, জীবনানন্দও "নেশন" শব্দটিকে যেন একটু আলাদা মূল্য দিয়েছিলেন, একটু বেশি ভারি ব'লে মনে করেছিলেন।

এঁদের এই সরলতাকে গ্রাম্যতা ব'লেও ভুল করা সম্ভব। এটুকু নিশ্চিত যে গ্রাম্য না হোক, এঁদের রচনার পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম। জীবনানন্দের ধানসিড়ি নদী হয়তো বরিশালে নয়, হয়তো তা আসামে,—ভূগোলে পড়েছিলেন বা মানচিত্রে দেখেছিলেন শুধু—হয়তো তাঁর খেজুর-ছায়া সুমের-ম্যমি বাইবেল কিংবা ইতিহাসের বই থেকে আহৃত, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি গ্রামকে (গ্রাম ঠিক নয়, গ্রামের গণ্ডির বাইরের নির্জনতাকে) এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো চিনতেন। এ-যুগের "ভদ্রমহিলা" অথবা চিরকালের নারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই শাশ্বত বাংলা দেশে—রাত্রে কৃষক-পরিত্যক্ত নির্জন মাঠে। ত্রিলোকধ্বংসকেও তিনি প্রাদেশিক রূপ দিয়েছেন; যে-কবিতার নাম "পৃথিবীলোক" এবং বিশ্বের ইতিহাস ও পরিণতি যার বিষয়, সেখানেও প্রলয় আসে পদ্মার ছদ্মবেশে :

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস দুটির ঘটনাস্থল বাংলাদেশের গ্রাম; এমন কি "জননী" নামক উপন্যাসেরও পরিবেশ গ্রাম্য—যদিও থিয়েটার ও ঘোড়ার গাড়ির উল্লেখ আছে।

এমন নয় যে ইংরেজের গড়া এই কলকাতাকে তাঁরা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো বটেই, জীবনানন্দের কলকাতাও এমন এক শহর যেখানে বড়ো রাস্তা নেই, শুধু গলি আছে। প্রধানত ভিখিরি, ইহুদি ও কাফ্রিদের অধ্যুষিত এই অবাস্তব, রোমাঞ্চকর নগর শুধু রাত্রিকালে জেগে ওঠে। সংখ্যায় যে-সব সম্প্রদায় নগণ্য, নগরীর প্রাণের সঙ্গে যাদের সংযোগ নেই, নগরীর বিপুল শরীরের ত্বকের উপর ব'সে যারা অন্ধকারে মশার মতো

একটু উদ্বৃত্ত রক্ত পান ক'রে বেঁচে থাকে, তাদের দিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা ভরিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বেকার, কেরানি ও সাম্যবাদীদের নগর, সেখানে যেন সারাক্ষণ সবাই রাস্তায় হাঁটছে। সমর সেনের কলকাতার বাসিন্দা নিরাশ বুদ্ধিজীবী। আর বুদ্ধদেব বসুর কলকাতায় কুকুরেরা রান্নাঘরের বাতাসে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে; রহস্যময় সেই নগর, কিন্তু আমাদের অচেনা নয়। তাঁর কলকাতায় বসার ঘরও আছে, মসীজীবী বেতনভোগী নাগরিকেরা ট্রামের হাতলে ঝুলে দশটায় আপিশেও যায়। চেনা শহর মায়াময় হ'য়ে যায় সংগোপনে, নিভৃতে, কল্পনার প্রভাবে। বুদ্ধদেব বসুর জঞ্জাল-কুড়ুনিরাও পরম নিঃসঙ্গ; বসার ঘর পরিত্যক্ত হ'লে তবেই গৃহী স্বরূপ ধারণ করেন; ট্রামের হাতলে—শরীর যখন শত শরীরের সান্নিধ্যে ঘর্মাক্ত—তখনো মন সুদূর, নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী। আর জীবনানন্দের নির্ধন, ভাবনাহীন সম্প্রদায় পশুদের মতো যূথচারী; তাদের প্রতি জীবনানন্দের আসক্তির প্রধান কারণ হ'লো তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বুদ্ধদেবের জঞ্জাল-কুড়ুনি নিঃসঙ্গ, ঈশ্বরকে তাই তার এতো প্রয়োজন। 'কল্লোল'-যুগের সেই চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে আজ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেছেন; সেই উচ্ছৃঙ্খল শব্দবিলাসী যুবক প্রৌঢ় বয়সে এমন এক নির্মম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন যে এমন কি গৈরিকও তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত রঙিন, প্রকৃতি খুব বেশি উত্তপ্ত, ক্যাকটাসও বড়ো বেশি লীলায়িত। রোমান্টিক ও ক্লাসিকালের সনাতন বৈপরীত্য যে কত অর্থহীন তার প্রমাণ এই যে সেই অতি-রোমান্টিক আজ অতি-ক্লাসিকাল। অথবা, এই উন্নত সন্ন্যাস, এই নিদারুণ নিস্পৃহতা, এই তৃষ্ণার্ত বৈরাগ্যও আসলে তাঁর রোমান্টিকতারই ছদ্মবেশ। তিনি চান "মলের ভাণ্ড" থেকে "সম্ভাব্য ঈশ্বর"কে ছেঁকে তুলতে, মাংসের পচনক্রিয়াকেও এক আধ্যাত্মিক রসায়নে তিনি পরিণত করেছেন। তাঁর পতিতজন পাপবোধক্ষম ধার্মিক; জীবনানন্দের লোল নিগ্রো প্রাকৃত। "বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে" সে হাসতে পারে, তার কারণ তার মনে পাপ-পুণ্যের স্থান নেই, আছে শুধু সুখ-দুঃখের। তার হৃদয় বেদনার দ্বারা দীর্ণ হ'তে পারে, পাপের স্পর্শে ক্লিন্ন হ'তে

পারে না; সে বড়ো জোর শুধু সৎ, পুণ্যবান নয়। জীবনানন্দ উদার, সংবেদনশীল, এবং মানবপ্রেমিক; তাঁর চেতনায় ঈশ্বরের স্থান নেই, তিনি ভূলোকধর্মী। বুদ্ধদেব বসু কঠিন, ক্ষমাহীন, এমন কি নিষ্প্রেম; তিনি তাঁর দেবীর জন্য জগতের লোকে যাকে অন্যায় ব'লে মনে করে বোধ হয় তাও করতে পারেন; ঐহিক অর্থে তিনি সাধু নন। জগতের লোকের সুখবৃদ্ধি করতে তিনি চান না। বুদ্ধদেব বসু দুঃখকে, অসুখকে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, কাম্য ব'লে মনে করেন। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য এক তীব্র আকৃতি লক্ষ করা যায়; বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক কবিতা প'ড়ে কোনো মানবহিতৈষী, পরোপকারী, সমাজসংস্কারক সমালোচকের মনে হ'তে পারে তিনি দুঃখকে কোনো এক তীব্র মাদকদ্রব্যের মতো ব্যবহার করেন, মনে হ'তে পারে তাঁর ভোগী ইন্দ্রিয় এখন এমন এক তীব্র অনুভূতি, চরম উত্তেজনা কামনা করে যা দুঃখ ছাড়া আর-কিছু দিতে পারে না, মনে হ'তে পারে বুদ্ধদেব বসু এখন দুঃখবিলাসী।

জীবনানন্দের বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখনও মাঝে-মাঝে তিনি ঐ লোল নিগ্রোটির মতো প্রাকৃতিক হবার প্রার্থনা করেছেন। তখনো "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক" বেসামাল হ'য়ে পড়েনি। তখনো তিনি ঘাসেদের নিশ্চিন্ত জীবন কাম্য ব'লে মনে করতেন। ঘাস-মাতার নিবিড় গর্ভে তিনি এমন এক উষ্ণ জীবন আবিষ্কার করেন যেখানে আত্মীয়তা আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, প্রাণ আছে, আর্তি নেই, বুদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা নেই, নেই পরকাল। তখনো কেমন অনায়াসে সব-কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রেও অঙ্কের শেষে বলতে পারতেন কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। আর কোনো-কোনো গভীর হাওয়ার রাত্রে, যখন তাঁর সুখশয্যা তরণীতে পরিণত হ'তো, স্ফীত মশারির পাল তুলে তাঁর নিদ্রালু দেহ নভোমণ্ডলে অভিযানে যেতো, তখন তিনি সর্বকালকে এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। সে-মুহূর্তে ধ্বংস ও মৃত্যু ধারণ করতো এক মহান কলেবর, যা দেখে ভয় করে, কিন্তু পুলকও জাগে।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো-এক সুখের মুহূর্তে "হলুদপোড়া" গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। নাম-গল্পটিতে মানুষ কোনো-এক নৃশংস শক্তির ক্রীড়নক-মাত্র। কিন্তু তৃতীয় গল্পটিতে চৈতন্য জয়ী হ'লো। রমেন সচেতন কিন্তু আত্মসচেতন নয়; অপরের দুঃখকে সে অনুভব করতে পারে, নিজের দুঃখে সে তাই কাতর হয় না; "কিশোর সন্ন্যাসীর মতো সে একেবারে নির্বিকার থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মতো খুশি হ'য়ে ওঠে কিন্তু গ'লে পড়ে না"; অপরেরা তাই তার "সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের ধাক্কায়" প্রথমে যেমন বেসামাল হ'য়ে পড়েন, পরে পরিবর্তিতও হন। জীবনানন্দের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবনে অন্তত এক সময় ধনুকের ছিলা টান ছিলো। কিন্তু কী অল্প সময়ের জন্য! পরমাণুর মত্ত হৃদয়েও এক ক্ষীণ মুহূর্তের জন্য স্থিতি আসে, পরমুহূর্তেই ভাঙন শুরু হয়, হয় তাকে পরিবর্তিত হ'তে হয় অন্য কিছুতে, অন্য এক স্থিতাবস্থায়, অথবা সে বিনষ্ট হয়, পরিণত হয় অপর পরমাণুর দাসে। এঁদের দুজনের জীবনেও সংকটের এমনি মুহূর্ত এসেছিলো, ধনুকের ছিলা গিয়েছিলো ছিঁড়ে; আস্থা রাখা দুরূহ হ'য়ে উঠেছিলো; রচনার কৌশল পরিণত হয়েছিলো শুধুমাত্র অভ্যাসে।

কিন্তু তার আগে তাঁরা রচনা ক'রে গেলেন বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস। জীবনানন্দ উপমার পরিচিত সামান্যতার ধারণাকে ধ্বংস ক'রে দিলেন। বস্তুর মধ্যে অজ্ঞাত জীবন আবিষ্কার করলেন; ঘ্রাণ পরিণত হ'লো দৃশ্যে; ছবি পরিণত হ'লো স্পর্শে, স্পর্শ হ'য়ে গেলো ধ্যান। চিত্রকল্পের মধ্যে আচম্বিতে মিলিত হ'লো বিপরীত অভিজ্ঞতা; বিপরীত চিত্রের মধ্যে জন্ম নিলো নতুন বোধ। যেন তাঁর পাঁচটি নয়, সংস্র ইন্দ্রিয়। তাঁর শরীরের সবটুকু যেন কম্পমান স্নায়ু; তাঁর প্রত্যেক স্নায়ু শুধু যে উত্তাপ-শীতলতা, দুঃখ-হর্ষ বোধ করতে পারে তা-ই নয়, তারা যেন বিবেকবান। এবং সেই সহস্র ইন্দ্রিয় আমাদের জন্য আবিষ্কার করলো এমন এক চৈতন্যময় জগৎ যা নিতান্তই আমাদের কালের। আগেকার কবিতায় জগৎ ছিলো মানুষের সুখদুঃখের প্রতিবিম্ব, এখন মানুষ জগতের বিবেকে পরিণত হ'লো। আধুনিক কবিতা

আবেগ এবং বুদ্ধির অতীত; জীবনানন্দ অতি-চেতনার কবিতা রচনা করলেন। প্রকৃতির মধ্যে যিনি শুধুমাত্র সৌন্দর্য নয়, দুঃখও আবিষ্কার করলেন, তিনি কী ক'রে আর নিছক নিসর্গ-কবিতা রচনা করবেন? জীবনানন্দের পর থেকে বাংলা ভাষায় নিছক নিসর্গ-কবিতা লুপ্ত হ'লো। আর নিছক প্রেমের কবিতাও। যাঁর দৃষ্টিতে প্রেম মৃত্যুর মতো সব-কিছুতেই নিহিত আছে, যাঁর অনুভবে জল, নদী, বিশ্বাস—যা-কিছু সিঞ্চিত করে, জন্ম দেয়, ভাসিয়ে নেয়—তা-ই নারী; যিনি স্বীকার করেন "ঘাস, রোদ, শিশিরের কণা/তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা," তিনি কী ক'রে "এমন দিনে তারে বলা যায়" ধরনের প্রেমের কবিতা লিখবেন? আর নারী পরিণত হ'লো প্রকৃতির তীব্রতম, মদিরতম, উষ্ণতম, স্নিগ্ধতম জন্তুতে। সে "রক্তকরবী"র নন্দিনী নয়, কোনো মহান চিন্তার ফ্যাকাশে প্রতিমূর্তি নয়, সে-নারী প্রকৃতির রূপক নয়, সে দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর, তাঁর কবিতায় আলো আর অন্ধকার মিশে গেলো পরস্পরের মধ্যে, ঘুম আর জাগরণের ব্যবধান লুপ্ত হ'লো। বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেলো মৃত্যু। ভাবতে অবাক লাগে যে জীবনানন্দের আগে বাংলা কবিতায় আত্মহত্যা প্রবেশ করেনি। স্থির বিশ্বাসে আত্মদানের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে, কিন্তু আত্মহত্যার উদাহরণ নেই। এবং য়োরোপীয় সাহিত্যেও অকারণ আত্মহত্যা নতুন। জীবনানন্দের আগে সেই উট কি কোনো ভারতীয়কে আহ্বান করেনি? ডস্টয়েভস্কির আগে কোনো য়োরোপীয়কে?

মহাভারতেও আত্মহত্যার উল্লেখ আছে: ভীষ্মের। কিন্তু সেই মহান মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, আত্মবিজয়। বিশ্বসাহিত্যে আর কার মৃত্যু এমন পরিপূর্ণ, এমন সার্থক? আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে—যাদব ও তাঁর স্ত্রীর। এই যুগ-আত্মহত্যার চিন্তা পাঠকদের অবশ ক'রে ফেলে; অকারণ, নিতান্ত অকারণ এঁদের আত্মহত্যা। এমনকি "আট বছর আগের একদিন"-এর নায়কের মৃত্যুও এত অকারণ নয়। তবু তো সে নিজে, সজ্ঞানে, তার মৃত্যু চেয়েছিলো। যাদব বা তাঁর স্ত্রী এ-মৃত্যু চাননি; অথচ পরিত্রাণের

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধরা দিলেন। যেন তাঁদের মনের অন্তরালে যে-সব সূক্ষ্ম তারে বা স্নায়ুতে জীবনশক্তি সঞ্চালিত হয় তা ছিঁড়ে গেছে। এক অন্ধ শক্তির কবলে এই ইচ্ছারহিত দম্পতি নিজেদের ছেড়ে দিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, এবং গল্পে, এই প্রথম আমরা এমন এক শক্তির পরিচয় পাই যা খাদ্য বস্ত্র যৌন প্রয়োজন এর কোনোটাই নয়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, অথচ যা আমাদের সারাক্ষণ পরিচালিত করছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির অগম্য যে-লোক তা তিনি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করলেন।

উপন্যাসে এতে'কাল ব্যাখ্যা ছিলো, ছিলো বর্ণনা, ছিলো ইতিহাস, বক্তৃতা, বিতর্ক। "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় আছে চরিত্রের ও ঘটনার স্পষ্টতা, এমন স্পষ্টতা যা গাঢ় হ'তে-হ'তে পরিণত হয় অর্থের আভাসে ও সংকেতে। ভূতোর মৃত্যুর দিন যাদবের সঙ্গে শশীর দেখা,—লাঠি ঠুকে-ঠুকে যাদব উপন্যাসে প্রবেশ করলেন। "লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য। মরিতে যাদব কি ভয় পান—জীবন-মৃত্যু যাঁর কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁহার ভয়?" এটুকু যথেষ্ট। মুহূর্তে আমরা বাকিটা দেখতে পাই। যে-অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে সেই প্রথম পরিচ্ছদের শেয়ালটি দেখেছিলো, সেই রকম এক জান্তব বোধ পাঠকের মধ্যেও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।...."মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনের মাঠ দিয়া ছপছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মুখ ফিরাইয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!" পাঠক কী ক'রে টের পান তা তিনি স্পষ্ট বোঝেন না—লেখক তাঁর সংকেতগুলি এমন গোপনে শশীর ভাবনায় লুকিয়ে রেখেছেন। মরতে যাদব কি ভয় পান? পান, আবার পানও না। জীবন-মৃত্যু তাঁর কাছে সমান, আবার সমানও নয়। সমান না-হ'লে তিনি কি নিজেকে ঐভাবে হত্যা করতেন—পলায়নের উপায় থাকা সত্ত্বেও? আবার সমানও নয়; মৃত্যুর মুহূর্তেও জনমতকে ভয় ক'রে গেলেন, সংসারীর চেয়েও তিনি মোহগ্রস্ত। সাপের কামড়ে ভয়? হয়তো। কিন্তু আফিম-নামক বিষেই তো তাঁর মৃত্যু,

এবং স্বেচ্ছায় সে-বিষ তিনি পান করলেন। টমাস মান্ হ'লে ইঙ্গিতটিকে আরো জটিল করতেন, বিস্তারিত করতেন, "পাগল দিদি" নামের অর্থময়তা আরো স্পষ্ট হ'তো। কিন্তু হয়তো এই ভালো, এমন সংগোপনে বিকশিত অর্থের সৌরভ তীব্রতর হ'লে আমরা তার মূলের সন্ধান করতাম, অজ্ঞাতকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও টমাস মান্ কিংবা অন্য যে-কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিকের রচনার মতো অতিপ্রাকৃত ব্যঞ্জনায় টইটুম্বর। শুধু তিনি তাঁদের মতো আত্মসচেতন নন। ধ্যানলব্ধ ছবির মধ্যে আরো কিছু ভ'রে দেবার তাঁর প্রয়াস নেই। টমাস মানের উপন্যাসে দিব্যদৃষ্টি তো আছেই, আরো আছে বুদ্ধি, আছে আবহমান সাহিত্যের স্মৃতি। তাঁর উপন্যাস শুধু সাহিত্য নয়, খুব বেশি সাহিত্য। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসই যেন নেই। মনে হয় যেন প্রকৃতির মতোই নিজের অজ্ঞাতে তিনি স্তরে-স্তরে এমন রত্ন রেখে গেছেন, এই আমাদের মতো বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদ্ না-থাকলে বুঝি সে-ঐশ্বর্য অন্ধকারেই প'ড়ে থাকতো। যে-সব চিহ্ন দেখে কোনো আধুনিক লেখকের গুপ্ত ঐশ্বর্যের আমরা সন্ধান পাই, সে-সব ইঙ্গিত কোথায়? কোথায় সেই ব্যাকরণলঙ্ঘন, সেই আজগুবি "পরীক্ষা-নিরীক্ষা", যা দেখামাত্র এমনকি "পত্র-পত্রিকা"র সমালোচকেরা যে কোনো উপন্যাসকে অভিনব ব'লে চিনতে পারেন?

প্রথম পাঠে "পুতুল নাচের ইতিকথা"কে মনেই হয় না আধুনিক। অথচ এই উপন্যাস অন্য কোনো যুগে রচিত হ'তে পারতো না। আঠারো শতকের ইংরেজি উপন্যাসে কোনো-না-কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রতিপাদ্য ছিল; উনিশ শতকের উপন্যাসে ধরা পড়েছে ব্যক্তি এবং সমাজের চরিত্র, স্বাভাবিকতা ছিলো সে-যুগের শিল্পীর চরম লক্ষ্য। আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক (এবং এমন কি বুডেনব্রকস্-এর টমাস মান্) রচনা করেছেন পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস, ক্রমাবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা, বিভিন্ন যুগের দ্বন্দ্ব। বিশ শতকের গোড়ার দিকের উপন্যাস আসলে উনিশ শতকে রচিত হওয়া উচিত ছিলো। বিশ শতকে এসে উপন্যাস যেমন ছড়িয়ে পড়লো তেমনি

আবার গুটিয়ে নিলো নিজেকে ; তার বিষয় হ'লো একদিকে যেমন সারা ব্রহ্মাণ্ড, অন্য দিকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখা, অন্তরিন্দ্রিয়ে পাওয়া অনির্বচনীয়, সূক্ষ্ম এক অভিজ্ঞান। চরিত্র নয়, ব্যক্তির অন্তস্থলে যে-রহস্যটি আছে ; সমাজ নয়, সমাজের আদিতে যে-সংস্কার, প্রাণ, ধর্ম লুকিয়ে আছে ; প্রকৃতি নয়, চেনা জগতের মর্মে যে-শক্তি আবদ্ধ আছে তা আত্মপ্রকাশ করলো আধুনিক উপন্যাসে। মানুষ ও পশু, যন্ত্র ও প্রকৃতির সংঘর্ষে মানুষ হারালো তার বিবেক, পরিণত হ'লো পশুতে ; জন্তুরা হারালো তাদের পশুত্ব, হ'লো বিশুদ্ধ প্রাণী ; আর প্রকৃতি তাঁর ভীরুতা থেকে মুক্ত হলেন, স্থূলত্ব হারালেন, তাঁর জড়ত্ব উবে গেলো। কোথায় গেলো আঠারো শতকের শিথিল, অগোছালো, নির্জীব প্রকৃতি ? আর রোমান্টিকদের প্রিয় সেই সরল, স্নেহশীল প্রকৃতি ? বিশ শতকে তিনি তাঁর মানবিক রূপ হারালেন ; প্রকৃতি এখন নির্বিবেক, নিশ্চেতন, নির্মম। আরো পরিবর্তন হ'লো। এখনকার উপন্যাসে চরিত্রের বা ঘটনার, সমাজের বা প্রকৃতির ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। লেখক আর চরিত্র উদ্ঘাটনের নিমিত্ত ঘটনার বর্ণনা করেন না, বিশাল সমাজের ছোটো আয়না হিশেবে ব্যবহার করেন না ব্যক্তিচরিত্রকে, নায়কের মেজাজের প্রতিধ্বনি শোনেন না প্রকৃতির মধ্যে। যেমন ছবি শুধু রেখা নয়, রং নয়, ঘন-হাল্কা ছায়া-আলো নয়, তা যেমন এই সব-কিছু দিয়ে গড়া নতুন এক সত্তা, তেমনি এ-কালের উপন্যাসে চরিত্র, ঘটনা ও সমাজ পরস্পরে মিশে যায়, সব মিলে তৈরি হয় এক পরিপূর্ণ ছবি। "পুতুল-নাচের ইতিকথা"য় গল্প নেই, অন্তত এমন গল্প নেই যা সংক্ষেপে মনোহরণ করতে পারে। আর চরিত্র ? অসংখ্য চরিত্র,—জীবন্ত, স্বাভাবিক,—কিন্তু কোনো চরিত্রকেই আমাদের চোখের সামনে বেশিক্ষণ রাখা হয় না, তারা পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করার আগেই অপসৃত হয়, যেন লেখক তাঁর জগন্নাথের রথের তলায় সবাইকেই বলি দিতে পারেন, যেন উপন্যাসের সম্মিলিত গতিকে যে-কোনো চরিত্রের চাইতে বেশি মূল্যবান মনে করেন তিনি। এবং, উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের ভূগোল যদিও আমাদের কাছে স্পষ্ট—বাংলাদেশের সজলতায়, শ্যামলতায় যেন উপন্যাসটিও স্যাঁৎস্যাঁত করে, পড়তে-পড়তে পাঠক

চোখের সামনে সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রং দেখতে পান না—তবুও বিশেষ ক'রে নিসর্গশোভার বর্ণনা আছে সারা উপন্যাসে কয়েক লাইনমাত্র। বিভূতিভূষণ থেকে কত ভিন্ন তিনি ! এবং তারাশঙ্করও তিনি নন। প্রকৃতি যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় নয়, তেমনি গত যুগ এবং এ-যুগ, যামিনী কবিরাজ ও শশীর ডাক্তারি, যাদবের পঞ্চর-নির্মিত হাসপাতাল ও চরক-সুশ্রুতের বিরোধ তাঁকে আকৃষ্ট করে না। তাঁর উপন্যাস পড়লে অন্তত মুহূর্তের জন্য মনে হয় যে গলসওঅর্দি বা তারাশঙ্কর বর্ণিত বিরোধিতা মানুষে-মানুষে বিরোধ, আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝায়ে ঝায়ে কলহের মতো তা স্থানীয়, ক্ষণকালীন ও নগণ্য। কী বিপুল, নিষ্ঠুর, সীমাসংহীন যুদ্ধের সঞ্চয় তিনি ; সে-যুদ্ধ চিরকাল ধ'রে চ'লে এসেছে ; হিম, জড়, স্থবির নক্ষত্র থেকে পরমাণুর হৃদয়ে দুরন্ত বিদ্যুৎপুঞ্জ পর্যন্ত সব-কিছু সে-যুদ্ধে লিপ্ত ; জড়ত্বের সঙ্গে চৈতন্যের সে-অনাদি সংঘর্ষে কোনো পক্ষই পরাজিত হয় না—শশী যদিও হেরে যায়, লেখক তাকে কল্পনা ক'রেই প্রমাণ করেন চৈতন্য এখনো লুপ্ত হয় নি।

জীবনানন্দ এক সময়ে সেই সব মমতাবান মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যারা "মরণের আগে মৃতদের জন্য" একটু আরামের ব্যবস্থা ক'রে দেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মৃতপ্রায় রোগীও বেঁচে থাকতে চায় "উজ্জ্বল সমাজে"র আশায়। কিন্তু শরীরের সব অভাব দূর হ'য়ে গেলেও মানুষের মনে সেই নিরীশ্বরের দূত হানা দিতে পারে। আর, পদ্মার তীরে প্লাবন যেমন আসে, সে-বন্যা নেমেও যায় ; প্রচণ্ড ঝড়ের আয়ু মাত্র এক রাত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রকৃতির কৃপণতা, সামাজিক অবিচার,—সবই মানুষের চেষ্টায় বদলাচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কবে, কী উপায়ে প্রশমিত হবে শোক ? "পদ্মানদীর মাঝি"র যে-একটিমাত্র বাক্যকে মনে হয় লেখকের আপন কথা তাতে মানুষের হৃদয়ের এই দুর্বলতার উল্লেখ আছে। বন্যার জল যখন ক'মে এলো তখন কে যেন সংগোপনে, নিঃশব্দে সংশয় প্রকাশ করে। এই কিছুক্ষণ আগেও তো প্লাবন ছিল দুর্জয় ! আকাশ যখন বিরুদ্ধতা করে মানুষ তখন আত্মগোপন

করবে কোথায়? প্রলয় নেমে এসেছিলো পদ্মার তীরে। সে-প্রলয় কি এত শীঘ্র দমিত হয়েছে?

কমে মাঠ ঘাটের জল।
ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বই কি। একদিন মালার বড় ভাই অধর খবর লইতে আসে।

অকথিত সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের চৈতন্য সম্পর্কে এমন এক তথ্য প্রকাশ করলেন যার পর বন্যার প্রশমনের সংবাদেও আমরা সুখে অধীর হ'য়ে যাই না। জীবনে সুখের কারণ নিশ্চয়ই আছে, মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য জন্ম। তবুও মানুষের চোখের জল শুকোয় না, তার কারণ যে-মানুষ মারা যায় সে আর ফিরে আসে না, যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তারও একদিন মৃত্যু হবে। এবং দুঃখ যেমন সুখের স্মৃতি এবং আশা মুছে ফেলতে পারে না—তা না-হ'লে কে আর প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারতো?—তেমনি সুখই দুঃখের উর্বরতম ভূমি। জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "সৃষ্টির নাড়িতে হাত রেখে" টের পেয়েছিলেন "অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;/তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণ শোধ।"

অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হ'লো ঋণ শোধ হ'য়ে গেছে। জীবনানন্দ শেষ জীবনে এক নতুন শব্দের ব্যবহার শিখলেন: "তবু"। একটি কবিতার নাম "তবু"। কত কবিতা শেষ হয় "তবু" দিয়ে, কতো কবিতার গতি বদলে যায় এই শব্দটির আকস্মিক আবির্ভাবে।

এ যুগে কোথাও কোনো আলো নেই—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো.....
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজগুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

(১৯৪৬-৪৭)

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজে
কতোদূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।

('মানুষের মৃত্যু হ'লে')

চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রয়েছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

('অনন্দা')

উদ্ধৃতির আধিক্যের কারণ আছে। শেষ জীবনে জীবনানন্দ যে শুধু "তবু"র অযৌক্তিক মায়ায় ভুলেছিলেন তা-ই নয়, তাঁর শেষ কবিতাগুলি যেন মোহাবেশে লেখা—এমন স্রোতের মতো শব্দগুলি ব'য়ে যায় যে মনে হয় লেখক বুঝি আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর পুরোনো কবিতা ইন্দ্রিয়কে সিঞ্চিত ক'রে তবে পৌঁছতো বিবেকে, বুদ্ধিতে; তাঁর জাদুতে আমরা অবশ হতাম। এখন কেউ যেন তাঁকেই মোহিত করেছে, যেন এক ঘোরের মধ্যে লিখে চলেছিলেন তিনি। "অসীম স্বর্গ," "নীল নরক," "কান্তিময় আলো," "অন্ধ দুর্দশা," "ইতিহাসের গভীরতর শক্তি"—এ-রকম সব শব্দের আঘাতে আমরা কাতর হই। সেই কবি, যাঁর ঘ্রাণশক্তি ছিলো জন্তুর মতো, বাদুড়ের মতো জাগ্রত কান, মাছি এবং ইন্দ্রের মতো যাঁর সহস্র নয়ন, যাঁর ত্বক ধরণীর সূক্ষ্মতম স্পন্দন সাপের মতো গ্রহণ করতো, সেই উপমার সম্রাট চিত্রকল্পের জাদুকর হঠাৎ কেমন যেন গরিব হ'য়ে গেলেন, জরা যেন আচ্ছন্ন করলো তাঁর ইন্দ্রিয়, স্নায়ুরা এমন দুর্বল হ'য়ে পড়লো যে শুধু শব্দ, অগণিত শব্দ প্রসব করতে শুরু করলেন তিনি। অবশ্য এখনো কোনো-কোনো পংক্তির স্পষ্টতায় চমকে উঠতে হয়, পাঠকের মন ভ'রে যায় গন্ধে, রঙে। "সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে" (কী অতিপ্রাকৃত স্পষ্টতা ঐ অপ্রত্যাশিত বিশেষণে!) আমরা "জেগে উঠে দেখি" কে যেন (এঁকে চিনি না, ইনি আমাদের সে-জীবনানন্দ নন) "ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে ঘুচিয়ে দিতে জান প্রতিভা আকাশ নক্ষত্রকে ডাকে।" আমরা লক্ষ

করি "সাতটি তারার তিমিরে"ই যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, "সময়সাগরের তীরে," অতিরিক্ত আলোয় সব-কিছু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। বর্তমান জগৎ বেদনাদায়ক হ'তে পারে, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়গোচর; আকাশকুসুম যতই সুন্দর হোক, তার রূপ মরচক্ষুতে কেউ দেখেনি। তাঁর পরিচিত জগৎকে তিনি অস্বীকার করলেন, কারণ তা এতো স্পষ্ট, এতো জীবন্ত ছিলো যে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুভূতিতরঙ্গে তা প্লাবিত করতো, বাধা দিতো বিবেকে, বুদ্ধিকে করতো কাতর। এর পরিবর্তে, তিনি শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আরেক জগৎ গ'ড়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু সেই ঈপ্সিত জগৎ নিরুত্তাপ, নির্জীব, অশরীরী। আমরা বুঝি কেন তাঁর হৃদয় অনুভূতির এমন তীব্র বর্ষণে গ'লে গেলো, ভেঙে গেলো—সামান্য মানুষ আর কতোটুকু সহ্য করতে পারে! কিন্তু আমাদের শরীরে আর সেই রোমাঞ্চ জাগে না, অভিভূত হয় না ইন্দ্রিয়।

আর আমাদের বুদ্ধিও নিরাশ হয়। কেন, আমরা প্রশ্ন করি, কেন তাঁকে অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক জোড়াতালি দিয়ে প্রত্যেক কবিতা শেষ করতেই হবে? এমনকি শিল্পীকুলচূড়ামণি ঈশ্বর তাঁর মানবজীবন-নামক মহৎ নাটক শেষ করেছেন নায়কের মৃত্যুতে; আমাদের কেন তবে প্রতি নাটককে কমেডিতে পরিণত করতেই হবে? মানুষের যে-শরীর আমরা চিনি তা রোগজীবাণুতে পূর্ণ, তার অন্ত কখনোই মলহীন হয় না। কোনো চিকিৎসকের যদি এমন বাসনা হয় যে তিনি তাঁর রোগীকে নির্মল করবেন, যদি তিনি মানুষের শরীরের শরীরত্ব অস্বীকার করেন, তবে বিশুদ্ধ প্রেতে পরিণত হবে তাঁর রোগী। যিনি পৃথিবীর অসম্পূর্ণতাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারেন না, তিনি অন্ধ, তিনিই জীবনবিরোধী, তাঁরই জীবনবোধ শিথিল। মিথ্যাভাষণ, অজ্ঞতা, ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব—এরাই মৃত্যুর সহায়। যে-কবি সময়সাগরের পরপারে অবস্থিত এক বিশুদ্ধ জগতের ধ্যান করেন, "আগুনে-আলোয় জ্যোতির্ময়" এক লোকে "উত্তরপ্রবেশ" করেছেন ব'লে প্রচার করেন, মানুষকে হিংস্র, লোভী, ভীত জেনেও বলেন তবু এ-সব সে নয়, তিনি তাঁর শিল্পকে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে, তাঁর "জীবনবোধ"কে বিসর্জন দিয়েছেন। কবিতা ততো দূরই অগ্রসর হ'তে

পারে যতো দূর মানুষের অবচেতনা, চেতনা এবং অতিচেতনার অধিগম্য। তার পরে যা আছে তা প্রাঞ্চেটে জানা যায় হয়তো, রাজনৈতিক কল্পকথায় মানুষ হয়তো হিংসা, লোভ, ভয় পরিত্যাগ করতে পারে, জাদুবিদ্যায় হয়তো প্রকৃতির নিয়ম বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু কবিতায়, দর্শনে এবং বিজ্ঞানে মেনে নিতে হয় মানব বা জড়প্রকৃতিকে। কোনো আহ্লাদি ভোটদাতা যদি নিষ্কণ্টক সমাজের আব্দার করেন তবে ভোটলোভী নির্বাচনপ্রার্থী সে-চিরসতেজ আকাশ-কুসুমের বর্ণের ছটা, গন্ধের মাদকতা বর্ণনা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু যে-ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন পৃথিবীর বুকে আরেক তুষারযুগ আসন্ন, তিনি, সে-সম্ভাবনা ভয়াবহ ব'লে, কী ক'রে অভয় দেবেন তুষার-যুগ আসছে তবু আসছে না? কোন জ্যোতির্বিদ বলবেন সৌরলোক অবিনশ্বর? পাঠকের তুষ্টির জন্য কোন শেক্সপীরর বলবেন যে মানুষ স্বর্গের শিশু? কবে কোন কোমল ডস্টয়েভস্কি আশ্বাস দিয়েছেন পৃথিবী নিষ্পাপ ব'লে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মান্তরের কাহিনী সুবিদিত। তিনি যে-জগৎ শিশুর মতো উপলব্ধি করেছিলেন তা হৃদয়-বিদারক, যে-নতুন পুরাণ-কথা তিনি সংশয়হীন চিত্তে মেনে নিলেন তাতে ঐ সব হৃদয়বিদারক ঘটনার মানে খুঁজে পাওয়া গেলো। দেখা গেলো যে নিষ্ঠুরতা মানুষেরই এক চিত্তবৃত্তি নয়, আসলে তা নেহাৎই অস্থায়ী এক নড়বড়ে সমাজের বিধিপ্রসূত। বরং বর্তমানে যতোই নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাবে ততই উজ্জ্বল হবে ভবিষ্যতের আশা। কী সহজে হঠাৎ সব-কিছু শিশিতে-ভরা, লেবেল-মারা হ'য়ে গেলো। এখন কোনো চরিত্র রচনা করতে তাঁকে একটুও বেগ পেতে হয় না। যে-মুহূর্তে তিনি ঠিক করেন একজন জোতদার কিংবা একজন ঠিকেদারের চরিত্র গড়তে হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি "সাবধান-বিষ"-মার্কা আলমারি থেকে নামিয়ে আনেন বোতলের পর বোতল। স্বার্থ-চিহ্নিত শিশি থেকে অনেকটা, হিংসার শিশি থেকে আরেকটু, লোভ, ক্রোধ, কপটতা থেকে বাকিটা ঢেলে নিয়ে তৈরি হয় পাঁচন। সহজ, অতি তরল হ'য়ে গেলো সব-কিছু। চরিত্রের কোনো জটিলতা, ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন, পরিণতি—কিছুই রইলো না। রূপকথায় যেমন সকল দুঃখের কারণ

একটিমাত্র ঈর্ষাতুর সতিন কিংবা সিংহাসনলোভী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বর্তমান দুঃখের হেতু এই অযৌক্তিক সমাজ। এই সমাজ পরিবর্তিত হ'লেই—এবং কোন সমাজ অমর?—মানবসন্তানের জীবন অবিমিশ্র সুখের হ'য়ে উঠবে। রূপকথার শেষে তিলমাত্র সংশয়েরও স্থান নেই; পাঠকের এমন মনে হয় না যে বিগত রাজা যদি বিনয়ী ও ধৈর্যবতী দুয়োরানীকে ভালো না-বেসে অস্থিরচিত্ত, লাস্যময়ী, স্বার্থপর সুয়োরানীকে ভালোবাসতে পারেন, রাজপুত্রও তবে তাঁর আজকের প্রেয়সীকে পরিত্যাগ ক'রে আর কারো কালো কেশের সন্ধানে যেতে পারেন। আমাদের এমন সন্দেহ হয় না, তার কারণ রূপকথার চরিত্ররা মানুষ নয়, মানুষের ইচ্ছার ও আতঙ্কের ছায়া মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাও এমনি অপরিবর্তনীয়; তাঁর জোতদারেরা চিরকালের জন্য দাগি, তাদের লুপ্তি হ'তে পারে কিন্তু কখনো তাদের সংবিৎ জাগবে না, যা-ই ঘটুক তাদের মধ্যে কেউ শ্রেণীস্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে সন্ত হবে না কোনোদিন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে অত নিষ্ঠুর ছিলেন ব'লেই অত বেশি সহৃদয় হ'তে চেয়েছিলেন। দয়া করতে গিয়ে তিনি যা রচনা করলেন তা নিরানন্দ ও নির্জীব। কিন্তু তবুও, মাঝে-মাঝে, লেখকের সকল কৌশল ব্যর্থ ক'রে, তাঁর চরিত্ররা বুলির খোলস ফেটে আত্মপ্রকাশ করে; তাঁর সন্তানগণ তাঁর কাছে দাবি করে শুধু নাম বা আয়ু নয়, ব্যক্তিত্ব। এবং তখন, অতিরিক্ত দয়ার বশে, লেখক তাদের কাহিনীর উপর হঠাৎ যবনিকাপাত করেন। যেমন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাতা তাঁর ক্ষুধিত সন্তানদের আর্তনাদ সহ্য করতে না-পেরে তাদের হত্যা করেন, যে-প্রাণ তাঁরই দান, যাদের এ-পৃথিবীতে আনবার জন্য নিজে বারংবার মৃত্যুর দরজায় হানা দিয়েছেন, সেই প্রাণ, তাঁর নিজের শরীরের চেয়ে আপন শরীর তিনি যেমন ধ্বংস ক'রে দিতে পারেন স্নেহের তীব্রতায়, তেমনি দয়ার আতিশয্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আর্ত, তৃষিত শিশুদের কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হন। গল্পের নিয়ম উপেক্ষিত হয়, শিল্পীর সততা কোথায় হারায় কে জানে। যে-কাহিনীর সূত্রপাতে তিনি সতর্ক হন নি, সে-কাহিনী যখন

অমোঘভাবে এমন এক সংকল্পের দিকে ধাবিত হয় যা তাঁর ঐ রাজনৈতিক রূপকথার বিরোধী, তখন তিনি বলতে বাধ্য হন:

> গল্পের উপসংহারে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য। (গল্প লেখার চিরন্তন আইন ভঙ্গ ক'রে): নব'র মা এবং পিসী ঐ বন্যাতেই অক্কা পেয়েছে। জন্নরে অজ্ঞান অনাথ, ছেলেমানুষ নব এবং বাচ্চা মেয়েটাও যে মরে মেছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা যে বানানো গল্প নয় প্রমাণ করার জন্য জ্যান্ত সাক্ষী খাড়া করতে পারবো কিনা ভাবছি।

গল্পের জন্য "জ্যান্ত সাক্ষী"র প্রয়োজন অন্য কোনো লেখকের হয় না, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়। নব'র মা অভাবে এমন কাতর হয়েছিলো যে গুজব রটেছিলো সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে মরেনি, টাকাও জোগাড় হয়েছিলো, ডাক্তারও ডাকা হয়েছিলো অনাথের জন্য। সমাজ যদি সুখের একমাত্র প্রতিবন্ধক হ'তো তবে কোনো দুঃখ ছিলো না তাদের। কিন্তু আরো শত্রু আছে, এক যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পরমুহূর্তেই মানুষকে রণসজ্জা ধারণ করতে হয়। সাক্ষী চাই, নিজের কাছে, ও সমবিশ্বাসীদের কাছে, প্রমাণ করা চাই যে এ-কথা সত্য। তাঁর বানানো গল্প হ'লে সবটুকু দায়িত্ব তাঁর, কৌশলে এড়ানো চাই সে-দায়িত্ব। কারণ, এ-গল্পের আসল যে-উপসংহার তা এখন আর তিনি লিখতে পারেন না। সে-উপসংহার ভোলার ভান যতই করুন তিনি, আমরা ভুলিনি:

> কমে মাঠঘাটের জল।
> ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবেই তো।

লোককল্পনার যৌবন নির্ভীক, এমনকি দুঃসাহসী। বার্ধক্যের শিল্পী নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন, বিপরীতের সমন্বয় ঘটান, স্বর্গ-নরকের যুগ্ম ছবি আঁকেন। গ্যেটে এবং টমাস মান্ অন্ধকার থেকে আলোয়, রোমান্টিক থেকে ক্লাসিকে, নরক থেকে স্বর্গে নাকি পৌঁছেছিলেন। শেক্সপিয়রের যে-ছবি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় তা এক বিষাদবিলাসী, নরকদর্শী যুবকের, যিনি প্রৌঢ়বয়সে সংশয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে মিলনে, সমাধানে, শান্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। লোককল্পনার সেই শিল্পী জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে তাঁরা ছিলেন বেহিসেবি; পাঠককে তাঁরা শেখাতে

চান নি কী ছলে বেঁচে থাকা যায়, শুধু জানাতে চেয়েছিলেন কী ব্যথার ছায়ায় আমরা বেঁচে থাকি। পরিণত বয়সে জীবনধারণের মন্ত্র দিলেন তাঁরা, শোনালেন আশার বাণী, শেখালেন বিস্মৃতির কৌশল। মহৎ শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর রচনা ছেড়ে জীবনকে বরণ করেন? মানুষের চেয়েও মহৎ কি তিনি নন যিনি দুঃখের গরলকে কণ্ঠে ধারণ ক'রে পৃথিবীকে নিরাপদ ও বাসোপযোগী ক'রে তোলেন?

সায় দিতে যতই চাই, আমরা এ-প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলতে দ্বিধা করি। আমাদের মনে হয় এ-বিস্মরণ জীবন নয়, নিদ্রা। মিথ্যা যদি সুখপ্রদ হয় তবে তীব্র ব্যথায় অধিকাংশের পক্ষে এ-বটিকা সেবন না-ক'রে উপায় নেই, কিন্তু স্রষ্টা যিনি, তিনি কী উপায়ে মিথ্যা থেকে প্রাণ সৃষ্টি করবেন? সংজ্ঞালোপের এতো উপায় থাকতেও চিকিৎসক আসন্নপ্রসবাকে জাগ্রত থাকতে বলেন। শিল্পীকে নিষ্ঠুর হ'তেই হবে—না-হ'লে অপর নয়নে অশ্রু উদ্গত হবে কেন? শিল্পী সেই রহস্যময় হোসেন মিয়া, যার আসল ইতিহাস কেউই সঠিক জানে না, যে যৌবন কাটিয়েছে বিদেশী বন্দরে-বন্দরে, দিক হারিয়ে যে রাত্রে খুঁজেছে তারার নিশানা। যা শুধু কল্পনা ছিলো, অলস মনে একটি ঝিলিকের মতো যা এসেছিলো এবং সেইভাবেই যা মিলিয়ে যেতে পারতো তাকে স্থায়ী রূপ সে দেবে—এই ছিলো তার জীবনের ব্রত। সেই সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সে সঁপে দিলো তার সব-কিছু। যা-কিছু সে উপার্জন করেছিলো—শুধু সঞ্চিত অর্থ নয়, তার সারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও—সে সমর্পণ করলো তার স্বপ্নকে। এবং তার উপনিবেশে আশ্রয় নিলো সেই সব মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজ যাদের পরিত্যাগ করেছে। তারা হোসেন মিয়ার কল্পলোকে কণ্টকর কিন্তু নতুন জীবন লাভ করলো। এই জীবনশিল্পীর দৃষ্টি স্বচ্ছ, হৃদয় একাগ্র। তার ঐ অদ্ভুত উপন্যাসের চরিত্র সংগ্রহ করবার জন্য সে যে-কোনো নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে রাজি ছিলো। তার বিষয়বুদ্ধি—যার দ্বারা সে ইতিপূর্বে ব্যবসায়ে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলো—তা সে নিয়োগ করলো স্বপ্নের কাজে। এবং যখন তার রচনায় পুরোনো

পৃথিবীর নীতি প্রবেশ ক'রে বিবাদ বাধালো তখন এই নিষ্ঠুর শিল্পী বর্জন করলো সেই কোমল নীতি, তার উপন্যাসের পক্ষে দুর্বল চরিত্রটিকে হোসেন মিয়া উৎপাটিত করলো। হোসেন মিয়া নিষ্ঠুর মানুষ, কিন্তু সফল শিল্পী। যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস শেষ হ'য়ে আসে, তখন কুবেরের নৌকো চলে হোসেন মিয়ার দ্বীপের দিকে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ পর্ব শেষ হয়, কাহিনী এতক্ষণে জ'মে ওঠে।

যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার স্রষ্টা তিনি কি জানতেন না তাঁর নিজের পরিণতির অর্থ? যে-জীবনানন্দ দাশ "তিমিরহননের গান" রচনা করেছিলেন, তিনি কি ঐ কবিতার শেষ কয় পংক্তির রমণীয় ফাঁকি লক্ষ করেননি? তিনি কি জানতেন না যে ঐ কবিতাটিতে চাওয়া অকস্মাৎ পরিণত হয় পাওয়াতে?

> আমরা কি তিমিরবিলাসী?
> আমরা তো তিমিরবিনাশী
> হ'তে চাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের মতো সত্যদর্শী কী ক'রে ভুলে ছিলেন যে এমনি এক ফাঁকি তাঁদের সমগ্র কাব্যেও লুকিয়ে আছে? আর যদি তাঁরা এ-কথা জানতেন, তবে কী বেদনাদায়ক না জানি তাঁদের জীবনের সায়াহ্নকাল! ঐ ভয়াবহ মৃত্যু কি তাঁদের গোপন ইচ্ছার পরিণতি? বন্ধ্যত্বের চেয়ে মৃত্যু বরণীয় মনে করেছিলেন তাঁরা? অথবা, তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন তাঁদের শিল্পকে নিদ্রার চরণে অর্ঘ্য দিয়ে—গোগোল যেমন সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, ফ্লরেন্সের চিত্রকরগণ যেমন সাভনারোলার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের অমর ছবি নিক্ষেপ করেছিলেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, উত্তরহীন প্রশ্ন। কিন্তু যদিও এগুলি আমাদের এতো ব্যাকুল করে, কে জানে এ-সব প্রশ্ন আসলে তেমন জরুরি কিনা। গ্যেটের চরম সৃষ্টি ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড নয়, তাঁর পরম সৃষ্টি তাঁর জীবন। ফাউস্ট সম্পর্কে সংশয় জাগলে, তাঁর কাব্যে তৃপ্তি না-পেলে, আমরা ধ্যান করতে পারি

গোটের অমর সৃষ্টি সেই দ্বিতীয় গোটেকে। প্রশ্ন করতে পারি তাঁকে, তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে পারি তাঁর জীবন, নিশ্চিত জানি যে কোথাও-না-কোথাও তিনি আমাদের সংশয়ভঞ্জনের মন্ত্র রেখে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্টির বাইরে কিছু লুকিয়ে রাখেন নি, "পুতুল-নাচের ইতিকথা"য় যা নেই তা লুম্বিনি পার্কের খাতাপত্রে পাওয়া যাবে না, জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে শত প্রশ্ন করলেও জানা যাবে না "আট বছর আগের একদিন" রচনাকালে তাঁর আত্মার মধ্যে কী ঘটছিলো। তাঁদের এই বিনয় উপেক্ষা করলে আমরা অতিরিক্ত কিছু লাভ করবো না, শুধু হারাবো শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে যা পেয়েছিলাম। তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এক স্বচ্ছ এবং শীতল গভীর হ্রদ যাতে অবগাহন করলে আমাদের নির্জীব স্নায়ুতে আবার প্রাণের স্রোত সঞ্চালিত হয়। জলের প্রাণের বর্ণ কী, তার শরীরের আসল আকৃতি কী, এমন কৌতূহল যদি কারো থাকে, যদি সে আকাশের ছায়ায় সন্তুষ্ট না-হ'য়ে দেখতে চায় জলের মুখের ছবি, তবে সে সেচনের ফলে উপরের ছবি হারাবে কিন্তু তল পাবে না। তার চেয়ে শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকা ভালো। বস্তুত, এমন নীল, এমন শীতল, এমন গভীর সরোবর এই দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে বিরল। এবং, যদি কোনো তরুণ হোসেন মিয়া তাঁর শিল্পকে এই প্রাণদাত্রী জলে সিঞ্চিত করেন তবে তাঁর ফসল দেখেই কি জানা যাবে না এ-জলের বর্ণ কী, শক্তি কী, কী তার অবয়ব ?

রোগশয্যায়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১

প্রাণে আসে মৃত্যু আর জীবনের দ্যুতি।
এ দরিদ্র করে শুধু স্তুতি
যেন দয়া পায়—
কেউ নেই যেবা মমতায়
দেয় ক্ষুব্ধ নির্জনতা ভরে—
আজকের আলোময় ঘরে
শুধু কেঁপে-কেঁপে যায় হাওয়া—
তার সঙ্গে মনে-মনে যৌবনের দিন ফিরে পাওয়া
আছে যেন এ-রোগশয্যায়।
প্রৌঢ়তা লজ্জায়
মুখ ঢাকে তবু চোখে আজ
ভেসে আসে না-পাওয়া সে স্মৃতমিত রমণীসমাজ।

২

দেখা দিলে চাঁদ
আমি বুঝি এখনো উন্মাদ
তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি আমি এখনো তেমন
এ-চাঁদের নীচে।
দুহাতে ঢেকেছ তুমি স্তন,
আমি আছি পিছে,
এ-ছবির উন্মাদনা পাই।
পেতে শুধু এক খণ্ড আকাশের সোনা-চাঁদ চাই।

শুধু ছবি দেখা!
বিছানায় শুয়ে একা-একা—
শুধু মনে-মনে ভাবা ছবি।
কানে শুনি সন্ধ্যার পূরবী,
মন মাত্র কামনায় জ্বলে,
জ্বালায় হয়তো চাঁদ তার মায়াচ্ছলে।

৩

শিশুর আনন্দ হ'তে কতো দিন হ'য়ে গেল হয়েছি বঞ্চিত!
তবু যেন কোনো শিশু ভীত
এ-হৃদয়ে উঁকি দিয়ে যায়।
তাকে আমি লুব্ধ মমতায়
ভেবে যে-উল্লাস পাই এই প্রৌঢ় দিনে—
জীবনের সে আনন্দ-ঋণে
রোগশয্যা মনে হয় ফুলের বাসর
জীবন-নৃত্যের সেথা বসেছে আসর।

তিনটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাল্মীকির ব্রতে

নিশ্চিত গহনে
তুমি স্থির থাকো
সর্পিল শিকড়ে
আগাছা পরগাছা
স্তরে স্তরে. তবু
তুমি স্থির থাকো
নিশ্চিত গহনে।

চুম্বনের আগে
চুম্বনের পরে
যে-শূন্যের জ্বালা,
যে-শূন্যের জ্বালা
জন্মের জীবনে
জন্মের মরণে;
স্বরবৃত্ত আর
ত্রিপদীর ফাঁকে
যে-শূন্যের জ্বালা,
সম্পূর্ণ কলসে
জলের দর্পণে
যে-শূন্য নিরালা,
সমস্ত তোমার
দেশজ ভাণ্ডার,

তুমি দয়া ক'রে
প্রকাশ্যে যেয়ো না।

বাইরে যেয়ো না
বুঝে নিতে শেখো
নিজের বল্কলে
বৃষ্টিজলকণা,
মুহূর্ত মুহূর্ত
বছর বছর
মুহূর্ত বছর
সমুদ্রের জলে
বৃষ্টিজলকণা ;
ফুরায় ঘটনা
বাল্মীকির ব্রত
শেষ তো হয় না
সমুদ্রের জল
বৃষ্টিজলকণা ॥

মেঘের মাথুর

দুটি মেঘ ছিলো দর্পতিচুম্বনে,
আর এই দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেলো :
জন্ম নিলেন ঈশ্বর নশ্বর।

একবার তাঁকে রাধার সঙ্গে দেখলাম
বাঁশরি ওষ্ঠে, কন্দর্প অসমভঙ্গে,
তারপর তাঁকে পাহাড় ভাঙতে দেখলাম :
কেউ নেই তাঁর অঙ্কে।

সব মানুষের পাপের পাহাড় কাঁধের উপরে তোলা,
নীল আকাশের স্তব্ধ যমুনা সপ্ততন্ত্রী গোলা
আর্ত আর্দ্র স্বর।

এক মেঘ থেকে আরেক মেঘের সাঁকো
গাঁথতে গেলেন, কিন্তু নিথর শূন্যে
মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর ॥

দৌহিত্রী

প্রদীপ জ্বালবে ব'লে অন্ধকারে ব'সে আছো। এ কি
মৃত্যুর চেয়েও স্থির পরিকল্পনার একাগ্রতা
তোমার চিবুকে। তুমি স্নিগ্ধ মাতামহের বয়স
বিত্ত ক'রে পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্ষমতা
পরীক্ষা করছো। তুমি স্বচ্ছ ঢেউ রয়েছো থমকি',
শিবলিঙ্গ-শিলাতলে, অন্ধকারের শান্ত রস।

প্রেমিকের দল কাঁপে বারান্দায়, একটি প্রেমিক
নির্বাচন ক'রে নিতে হবে, আর সে-প্রেমিক পিতা
হ'তে পারে, কালের জঠরতলে তোমারও দুহিতা
প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমি সব জানি, সবগুলি দিক
জানি আমি, তাই বলি, একদিকে এক অন্ধকারে
অপেক্ষাঘনিম চক্ষু জ্বেলে রাখো, যেয়ো না সংসারে ॥

সমর্পণ অমুক্ত এখনো

দীপক মজুমদার

অবশেষে বান্ধবীই মানতে হ'লো কী লজ্জা আমার
পাহাড় ডিঙিয়ে হাওয়া সপ্রতিভ ধূমল যুবক।
পরিদের উচ্ছলতা চমৎকার। নৃপতির শখ
এবার বিদেশ যাবো
স্মৃতি থেকে স্বপ্ন থেকে ছিঁড়ে ফেলি চিহ্নিত ডানার
অন্ধকারে ন'ড়ে ওঠা; অনশ্বর চোখের আকাশ
আঙুলের স্বর্গরাজ্যে মুখ, শিরা, ভ্রমরের বুকের প্রবাস।

ধ্যানেও বিব্রত নই কেমন প্রচণ্ড ভালোবাসা
নদীর গর্ভের নুড়ি চামড়ায় স্রোতের চোরা টানে
চমকে ওঠে, ছুটে যায় মৃত্যুরও অধিক নির্জনে।
অর্থহীন আর্তনাদ
আজ তার গাঢ়তার মারাত্মক স্বপ্নময় ভাষা
তোমার বোধের কাছে হেমন্তের পাতার সমান
আস্বাদিত সারাৎসার, সুন্দর, অলক্ষ্য এক ক্ষয়ের প্রমাণ।

অতএব বন্ধুতাই মানতে হ'লো কী দুঃখ আমার
সমুদ্র লাফিয়ে চাঁদ সুপ্রকাশ অলীক উজ্জ্বল
তারাদের আকর্ষণ রোমাঞ্চক অমোঘ প্রবল
এবার বিদেশ যাবো
অপ্রমত্ত কাপুরুষ, হিমস্রব আকাঙ্ক্ষার ভার,

রাজ্য থেকে প্রেম থেকে অপসৃত স্বর্গঘাতী স্রোতে।
ভাসমান ফুলগুলি কোনোদিন সম্মিলিত দ্বীপে
হয়তো নিবিড় মুক্তি, রাতি হবে তোমার সমীপে
প্রভাতে তখন আমি ফুল, পাখি, বন্ধু এক তুষার পর্বতে।

দুটি কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অসংকোচ

মাঝখানে পথ নেই, শুধু সম্ভবত কিছুক্ষণ
ঝর্নার নির্মল জল ধুয়ে যায় উদ্গত স্তাবকে।
এ কোন বিকালবেলা, মায়াবী, এ কোন সন্ধ্যাকাল,
তুমিও পাথর থেকে স্ফটিকধারার মতো ঝুঁকে।

তুমি কে তুমি কে নীল অক্লেশভরানো অনুপম
স্মৃতির নির্ভাজ ঢেউ মুছে কিবা লুকানো প্রান্তরে
ঝর্নার মতন ক্রূর; পুণ্য কতো নিষ্ঠুরতা জানে,
এ-তীর তরণীশূন্য, কেন পার হবো বনান্তরে।

আমার দুরাশা খুঁজে ভিতরে বাহিরে এই পথ
মিলেছিলো শুধু আর ধূ ধূ উদ্বেলার সারস
নিভৃত কবিতা, মৃত, নিশ্চিত, উদ্বেগহীন শ্লেষ…
মাঝখানে ছিলো পথ, প্রতিভার দুর্নিরীক্ষ্য ক্ষত।

নিমন্ত্রণ

কোথায় থেকে তোমার ডাক শুনতে পেয়ে এলাম গতকাল।
আমায় কেন ডেকেছো তাই বললে হেসে-হেসে,
এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে;
ক্ষেতের পর ক্ষেত ফুরালো, থামার, জঞ্জাল…
এবার তোমার পিছনপানে, আকাশ, আমি বৃষ্টি ফেলে যাবো।

তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই,
তুমি যেমন অপার জ্যোৎস্না সরিয়ে যেতে পারো,
চারিদিকের ক্ষেতখামার ঝর্না ব'য়ে যায়…
তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো চ'লে যাই
আকাশ, তোমার আশিখানা পড়শি কুটুম রাখলো নিজের হাতে।
কখন আবার ডাকবে, পিঁড়ি পাতবে, আমি বসবো উঠোন জুড়ে,
হয় যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই।
নেবুফুলের নরম পাহাড় গুঁড়িয়ে ঢোকে ঘরে
জানলা ভেঙে বাগান, কোথায় দূরের আগন্তুক?

বোধি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তেত্রিশ নম্বর বাড়ি কাল রাত্রে আমাকে বলেছে
ওরে হঠকারী যুবা,···শীতল, কঠিন, ঘন তার কণ্ঠস্বর
বৃদ্ধ অশ্বত্থের দীর্ঘনিশ্বাসের মতো উড়ে গেলো অন্ধকারে
স্তম্ভিত নির্বাক আমি বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখলাম।

এতকাল আমি তাকে শুধু ইট-কাঠ ভেবে লজ্জিত করেছি ;
কত মধ্যরাত্রি আমি আলো দিয়ে দাহ ক'রে, তীব্র, বিবসনা
বিশুদ্ধ রূপসী এক স্তব্ধতাকে বুকে নিয়ে, দুই হাতে, সমস্ত শরীরে
এঁকেছি প্রণয়চিহ্ন,—উন্মত্ত, উদ্দাম, ধৃষ্ট, লোভী।
কত নিদ্রাহীন চক্ষে আমার আত্মার মুখোমুখি
বসেছি নির্জন কক্ষে, হায় রে, অজড় এই তেত্রিশ নম্বর
ছিতল শরীরে তার সাতখানি খণ্ডিত হৃদয়ে
অবিরাম হাওয়া ভ'রে নিঃশব্দে হেসেছে, কিংবা তাম্র অন্ধকারে
ব্যাপ্ত ঊর্ণাজাল থেকে প্রপিতামহের লুপ্ত গোপন কৈশোর খুঁজে এনে
সে হয়তো মিলিয়েছে শান্ত কৌতূহলে।

এতদিন পর, শুধু কালরাত্রে আমাকে বলেছে—
যে-রাত্রে আমার চোখ অদ্ভুত হরিৎবর্ণে সহস্র রশ্মিতে জ্ব'লে উঠে
পঁচিশ বছর তারা এই ঘরে, সুর্কি-খসা প্রাকৃতিক দেয়াল-ছবিতে
নিষ্ঠুর স্মৃতির মূর্তি সাজিয়েছে ; কে চায় স্বপ্নের ভাষ্য, নষ্ট মুখ ?
আমার চীৎকারে—

এতকাল পর শুধু কাল রাত্রে আমাকে বলেছে,
ওরে হঠকারী যুবা···প্রতিটি অক্ষর তার তীক্ষ্ণ মনোযোগে
শুনে আমি, যা-কিছু সজল পুঁটলি বেঁধে শেষবার
সম্মুখ দ্বারের ভূমি স্পর্শ ক'রে, দৃশ্যমান আঁধারে মিলাই।

অনন্য

মৃণালকান্তি

আমি অন্ধকারের অপরূপ পায়ের ধ্বনি শুনেছি
দুপুরে সোনার ঝড়ে শুনেছি কার সুদূর ডাক,
পউষের ঝরাপাতার গান শুনেছি
আর ঝরা ফুলের কান্না—
বেলাশেষের গান সন্ধ্যার নদীর বুকে
আর পায়ের নিচের নরম ঘাসের বুকে আদরের সুর,
হঠাৎ কোনো বিরল মুহূর্তের আলোয়
আমি ধুলোর গান শুনেছি—
বৃষ্টিঝরা দিনে গাছের পাতাপল্লবে কিন্নরকণ্ঠের স্বরলিপি,
তোমার প্রচ্ছন্ন মনের রুচিৎ-কিরণে,
একটি দুটি কথায় যে-গান শুনেছি—
এমন গান আর শুনিনি।

সংশোধন

'কবিতা' চৈত্র, ১৩৬৫ সংখ্যায় রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী লিখিত 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর সমালোচনার শেষ অনুচ্ছেদে ভ্রমক্রমে 'টোয়েলফথ নাইট' ছাপা হয়েছে; উল্লিখিত বাক্তিটি 'Much Ado About Nothing'-এর নায়িকা, বিয়েট্রিস। ('No, sure, my lord, my mother cried; but then there was a star danced, and under that was I born.')

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু

KAVITA

(Poetry)

Vol. 24, No. 1

Serial No. 99

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

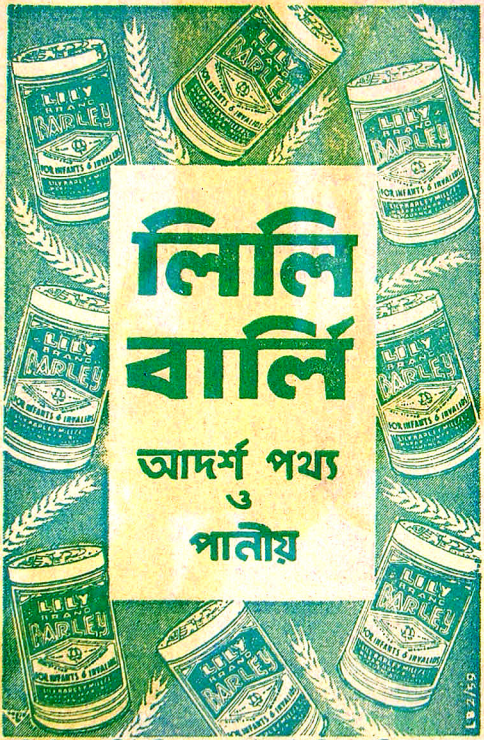

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪